ঈমানের রুকনসমূহ

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ইলমী গবেষণা ডীনশীপ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়ারা

অনুবাদ: মোহাম্মাদ ইবরাহীম আবদুল হালীম
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

أركان الإيمان



عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية



ترجمة: محمد إبراهيم عبد الحليم

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র




بسم الله الرحمن الرحيم

আরকানুল ঈমান বা ঈমানের মৌলিক অঙ্গসমূহ

ঈমানের রুকনসমূহ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতাদের, কিতাবসমূহের, রাসূলগণের, শেষ দিবসের এবং তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর ঈমান আনা।

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [البقرة: ١٧٧]

"বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকাজ হলো, যে ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফিরিশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের ওপর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

"সবাই ঈমান রাখে, আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং তাঁর নবীদের ওপর, তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩﴾ [القمر: ٤٩]

"আমরা প্রত্যেক বস্তুকে তাকদীর মোতাবেক সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আল-ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»

"ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ,

কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি ঈমান স্থাপন করবে। আরো বিশ্বাস রাখবে তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি।” (সহীহ মুসলিম)

ঈমানের সংজ্ঞা হলো, মুখে বলা এবং অন্তরে বিশ্বাস করা ও বাস্তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদন করা। ঈমান আনুগত্যে বৃদ্ধি হয়, নাফরমানী ও অবাধ্যতায় হ্রাস পায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤﴾ [الانفال: 2، ٤]

“প্রকৃত মুমিন তারাই যখন তাদের নিকটে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত পঠিত হয় তখন

তাদের ঈমান বর্ধিত হয়। তারা তাদের রবের ওপরেই ভরসা করে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার প্রদত্ত রুযী থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২-৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦﴾ [النساء: ١٣٦]

“এবং যে আল্লাহর ওপর ও তাঁর ফিরিশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং রাসূলগণের ওপর ও কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না তারা চরম পথভ্রষ্ট।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬]

আর ঈমান যা মুখের দ্বারা সম্পাদিত হয়: যেমন, যিকির, দো‘আ, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও কুরআন পাঠ করা ইত্যাদি।

অনুরূপ অন্তরের সাথেও ঈমান সংশ্লিষ্ট: যেমন, স্রষ্টা,

প্রতিপালক, পরিচালক, ইবাদতের অধিকারী এবং সুন্দরতম নাম ও মহান গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার (তাওহীদ) একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা‘আলার দাসত্বের আবশ্যকতায় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইচ্ছা-সংকল্প ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল।

আর অন্তরের কাজ হলো: আল্লাহর ভালোবাসা, ভয়-ভীতি, আশা-আগ্রহ ও ভরসা ইত্যাদি (সবকিছু অন্তরের ঈমান)।

অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্মসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সালাত, সাওম, হজ, আল্লাহর পথে জিহাদ, দীনী শিক্ষার্জন ইত্যাদি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا﴾ [الانفال: ٢]

“আর যখন তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত পঠিত হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।” [সূরা আল-

আনফাল, আয়াত: ২]

তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ﴾ [الفتح: ٤]

“তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত,৪]

সুতরাং অনুগত্য ও নৈকট্যশীলতা যত বৃদ্ধি পায়, ঈমানো ততো বৃদ্ধি পায়। আর অনুগত্য ও নৈকট্যশীলতা যত হ্রাস পায়, ঈমানো ততো হ্রাস পায়। যেমন-অবাধ্যতা ও নাফরমানী ঈমানে কু-প্রভাব ফেলে, যদি তা (নাফরমানী) বড় ধরণের শির্ক বা কোনো কুফুরী কাজ হয় তাহলে আসল ঈমানকে ধ্বংস করে দিবে। আর যদি ছোট ধরণের কোনো নাফরমানী হয় তাহলে ঈমানের পরিপূর্ণতায় ঘাটতি আসে এবং তা কলুষিত ও দুর্বল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾

[النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।” [সূরা আন- নিসা, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ﴾ [التوبة: ٧٤]

“তারা কসম খেয়ে বলে যে আমরা বলি নি। অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফুরী করেছে। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين شربها وهو مؤمن»

“ব্যাভিচারী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় না, চোর পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় চুরি করে না এবং মদ্যপায়ী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করে না, (অর্থাৎ উক্ত সময়ে তাদের ঈমান অপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়)।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

প্রথম রুকন: মহান আল্লাহর ওপর ঈমান

(১) ঈমানের বাস্তবায়ন

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা হয়।

প্রথমত: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্ব জগতের একজন প্রভু প্রতিপালক রয়েছেন। যিনি স্বীয় সৃষ্টি রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্ম ব্যাবস্থাপনায় রুযীদাতা, জীবন দাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাশীল এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো রব্ব প্রতিপালক নেই।

তিনি একাই যা ইচ্ছা তা করেন এবং যা চান তার হুকুম করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তাঁরই হাতে আসমান জমিনের রাজত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল ও জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

সকল আদেশ তাঁরই এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ তাঁরই

হাতে, তাঁর কর্মসমূহে কোনো শরীক নেই। তাঁর কর্মে তাঁকে কেউ পরাজয়কারী নেই; বরং মানব জাতি, জিন্ন জাতি ও ফিরিশতামণ্ডলীসহ সকল সৃষ্টজীব তাঁরই দাস বা বান্দা। তারা তাঁর রাজত্ব, শক্তি ও ইচ্ছা হতে বের হতে পারেন না।

তাঁর কর্মসমূহ অগণিত; কোনো সংখ্যাই তা সীমাবদ্ধ করতে পারে না। এ সকল বৈশিষ্টের তিনিই একমাত্র অধিকারী, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি ব্যতীত কেউ এ (বৈশিষ্ট্য)সমূহের অধিকার রাখে না। এসব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্কিত ও সাব্যস্ত করা হারাম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢]

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা, আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১-২২]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦﴾ [ال عمران: ٢٦]

“বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর,

আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦﴾ [هود: ٦]

“আর পৃথিবীতে বিচরণশীল মাত্রই সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলা নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে রয়েছে।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الاعراف: ٥٤]

“জেনে রেখ তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁরই বিধান, আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্ব জগতের রব।” [সূরা আল-

আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

দ্বিতীয়ত: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও পবিত্র পূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। যে নাম ও গুণের কিছু কিছু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর পবিত্র গ্রন্থ ও শেষ নবী ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বউত্তম নামসমূহ। তাই সে নামসমূহ ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃত কর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنـــة، وهـــو وتـــر يحب الوتر»

“আল্লাহর নিরানবব-ইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা যথাযথ বাস্তবায়ণ তথা সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আর এই আকীদা-বিশ্বাস দু’টি বড় মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথম: নিশ্চয় আল্লাহর সুন্দর নাম ও মহান গুণ রয়েছে, যা পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ করে, তাতে কোনো প্রকারের অপরিপূর্ণতা ও ত্রুটি নেই। সৃষ্টিজীবের কোনো কিছুই তার মতো ও তার অংশীদার হতে পারে না।

الحيّ (আল-হাইয়্যু) তাঁর (আল্লাহর) নামসমূহের একটি নাম। الحياة (আল-হায়াত) তাঁর সিফাত বা গুণ যা মহান আল্লাহর জন্য সমুচিত সঠিক পন্থায় সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর এ জীবন এক চিরস্থায়ী পরিপূর্ণ জীবন।

তাতে জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি সর্বপ্রকার পূর্ণতার সমাবেশ রয়েছে। আল্লাহ চিরঞ্জীব তাঁর লয় ও ক্ষয় নাই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“আল্লাহ ছাড়া কোনো সঠিক উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও নয়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]

দ্বিতীয়: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সকল দোষ ও ত্রুটি যুক্ত গুণ থেকে সম্পুর্ণভাবে পবিত্র। যেমন, নিদ্রা, অপারগতা, মূর্খতা ও যুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি।

তিনি আরো পবিত্র সৃষ্টিজীবের সাথে সাদৃশ্য রাখা হতে। আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (আল্লাহর) জন্য যে সকল গুণ অস্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করা অপরিহার্য।

আল্লাহ তা‘আলা যে সকল গুণকে নিজের জন্য অস্বীকার

করেছেন সে গুণের বিপরীত গুণে পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত, এই বিশ্বাস রাখা।

সুতরাং যখন আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে মুক্ত করব, তখন তন্দ্রার বিপরীত চির জাগ্রত এবং নিদ্রার বিপরীত চিরঞ্জীব পরিপূর্ণ দু'টি গুণকে সাব্যস্ত করা হবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহকে প্রতিটি অপরিপূর্ণ গুণ থেকে মুক্ত করলে সাথে সাথে তার বিপরীত পরিপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ আর তিনি ব্যতীত সবই অপরিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

"(সৃষ্টিজীবের) কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ٤٦﴾ [فصلت: ٤٦]

“আর আপনার রব বান্দাদের প্রতি সামান্যতমও যুলুম করেন না। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُۥ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ﴾

[فاطر: ٤٤]

“আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ৪৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا ٦٤﴾ [مريم: ٦٤]

“আর আপনার রব বিস্মৃত হওয়ার নন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৪]

আল্লাহর নাম, তাঁর গুণ ও কর্মসমূহের ওপর ঈমান আনয়ন করাই মূলত আল্লাহ ও তাঁর ইবাদতকে জানার একমাত্র পথ।

কারণ আল্লাহ তা‘আলা এই পার্থিব জগতে তাঁর সরাসরি দর্শনকে সৃষ্টিজীব হতে গোপন রেখেছেন এবং তাদের জন্য এমন জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা তাদের প্রভু ইলাহ্-মা‘বুদকে জানবে এবং সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করবে।

সুতরাং (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্তকারী) বান্দা তার গুণময় মা‘বুদের ইবাদত করে, পক্ষান্তরে মু‘আত্তিল (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী অস্বীকারকারী) মূলত অস্তিত্বহীনের ইবাদত করে, আর মুমাচ্ছিল (আল্লাহর সাথে উপমা স্থাপনকারী) প্রতিমার ইবাদত করে। আর মুসলিম ব্যক্তি এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ইবাদত করে, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নয়।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর লক্ষ্য রাখা উচিৎ:

(১) সংযোজন ও বিয়োজন ব্যতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সুন্দর নামসমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত

রয়েছে তার ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٣﴾ [الحشر: ٢٣]

“তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই। তিনি একমাত্র সব কিছুর মালিক, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, পর্যবেক্ষক, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে পবিত্র।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

হাদীসে এসেছে:

«وثبت في السنة أن النبي - ﷺ- سمع رجلاً يقول: اللَّهُمَّ إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات، والأرض يا ذا الجلال، والإكرام يا الحي يا القيوم. فقال النبي - ﷺ -: تدرون بما دعا الله؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم، قال:والذي

نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجــاب، وإذا سئل به أعطى».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, কারণ সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি ছাড়া কোনো সত্যিকার মা‘বুদ নেই। তুমি (মান্নান) অনুগ্রহকারী, আসমান জমিনের সৃষ্টিকারী। হে সম্মানিত ও মর্যাদাবান! হে চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বাহক!

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান? সে কিসের (অসিলায়) আল্লাহকে আহ্বান করেছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় সে আল্লাহকে তাঁর এমন ইসমে আজমের (মহান নামের) অসিলায় আহ্বান করেছে, যার দ্বারা আল্লাহকে আহ্বান করলে আল্লাহ আহ্বানে সাড়া দেন এবং আবেদন

করলে তিনি দান করেন।” (ইমাম আবূ দাউদ ও আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন)

(২) আল্লাহ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের কেউ তাঁর নাম রাখে নি এবং তিনি নিজেই এ সকল নাম দ্বারা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। এগুলো সৃজিত ও নতুন নয়। এর ওপর ঈমান আনা।

(৩) আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক যাতে কোনো প্রকারের কোনো ত্রুটি নেই। তাই এ নামসমূহের ওপর ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব, তেমনি এর অর্থের ওপর ঈমান আনাও ওয়াজিব।

(৪) এ সমস্ত নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

(৫) প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের ওপর ঈমান আনা।

এ পাঁচটি বিষয়কে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা আল্লাহর নাম السميع আস-সামী‘ (শ্রবণকারী) দ্বারা

উদাহরণ পেশ করবো।

السميع এতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য:

(ক) السميع (আস-সামী‘) আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম। এ কথার ওপর ঈমান আনা। কারণ এর বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

(খ) আরো ঈমান আনা যে,আল্লাহ তা‘আলা নিজেই নিজেকে এ নামে নামকরণ করেছেন, এ নামে কথা বলেন এবং তা কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন।

(গ) السميع (আস-সামী‘) আস-সাম‘উ বা (শোনা) অর্থকে শামিল করে। যা আল্লাহর গুণসমূহের একটি গুণ।

(ঘ) السميع (আস-সামী‘) নাম হতে উদ্ভূত “শ্রবণ করা বা শোনা” গুণটি অস্বীকার ও অপব্যাখা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

(ঙ) নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন এবং তাঁর শুনা

সকল ধনিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, এই বিশ্বাস রাখা। এ ঈমানের ফলাফল ও প্রভাব হলো আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তাঁর ভয়-ভীতি আবশ্যক হয়ে যায় এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে,আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহর গুণ العلي (আল-‘আলী) সাব্যস্ত করার সময় নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিৎ:

(১) কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সিফাত বা গুণ কোনো প্রকার অপব্যাখা ও সঠিক অর্থ ত্যাগ না করে প্রকৃতার্থে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

(২) দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় দোষ অসম্পূর্ণ গুণ থেকে মুক্ত, বরং তিনি সু-পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত।

(৩) আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সৃষ্টিজীবের গুণসমূহের সাদৃশ্য না করা। কারণ আল্লাহর অনুরূপ কোনো কিছু নেই। না তাঁর গুণে এবং না তাঁর কর্মে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

“(সৃষ্টিজীবের) কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

(৪) এসব গুণের রূপ ও ধরণ-গঠন জানার কোনো প্রকার আশা আকাঙ্খা না করা। কেননা আল্লাহর গুণের রূপ ও ধরণ-গঠন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। ফলে সৃষ্টিজীবের তা জানার কোনো পথ নেই।

(৫) এসব গুণাবলী হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান এবং এর প্রভাব ও দাবীর ওপর ঈমান আনা। সুতরাং প্রতিটি গুণের সাথে ইবাদত সম্পৃক্ত।

এখন পাঁচটি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য ইস্তিওয়া (الاستواء) গুণটির উদাহরণ পেশ করব।

আল-ইস্তিওয়া (الاستواء) গুণটি সাব্যস্ত করতে নিম্নবর্ণিত

বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য:

(১) আল-ইস্তিওয়া (আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপরে রয়েছেন) এ গুণটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এর ওপর ঈমান আনা; কেননা তা কুরআন ও হাদীসে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

“পরম দয়াময় (আল্লাহ তা‘আলা) ‘আরশের উপর রয়েছেন।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫]

(২) আল-ইস্তিওয়া (الاستواء) গুণটিকে যথাযোগ্য ও পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এর প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ‘আরশের উপরে রয়েছেন, যেমন তাঁর মহত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শোভা পায়।

এর অর্থ আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতই তাঁর ‘আরশের উপরে রয়েছেন; তাঁর মর্যাদার জন্য যেভাবে শোভা

পায়।

(৩) আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকাকে সৃষ্টজীবের আসন গ্রহণের সাথে উপমা না দেওয়া। কেননা আল্লাহ 'আরশের মুখাপেক্ষী নন। তিনি 'আরশের মুখাপেক্ষী নন; কিন্তু সৃষ্টজীবের কোনো কিছুর উপরে উঠা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সৃষ্টজীব এর মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

"(সৃষ্টজীবের) কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

(৪) আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কেননা এটা গায়েবী বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না।

(৫) এ গুণটি হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং

এর প্রভাবের ওপর ঈমান আনা, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করা, যা সমগ্র সৃষ্টি হতে তাঁর উর্ধ্বে ও সু-উচ্চে ('আরশের উপর) থাকাই প্রমাণ করে।

আরো প্রমাণ করে, সকল আত্মার তাঁরই দিকে ঊর্ধ্বমূখী হওয়া, যেমন সাজদাকারী সাজদাহ'য় বলে, (سبحان ربي الأعلى) আমি আমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি সু-উচ্চ ও ঊর্ধ্বে।

তৃতীয়ত: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]

"আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি

এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা অর্থাৎ শির্ক করা) থেকে নিরাপদ ও বিরত থাকবে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আর প্রত্যেক রাসূলই স্বীয় উম্মাতকে বলতেন,

﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥ﴾ [الاعراف: ٥٩]

“তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো সত্য উপাস্য নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে (শির্কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।” [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত: ৫]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে,

«أتدري ما حق الله على العباد ومـا حـق العبـاد على الله؟. قلت: الله ورسوله أعلم.قال:حق الله على العباد أن يعبـــدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً».

“তুমি কি জান? বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ক বা অধিকার কি? আর আল্লাহর ওপর বান্দার অধিকার কি?

আমি (মু‘আয) বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ক হলো: তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করা। আল্লাহর ওপর বান্দার হক্ক হলো: যারা তাওহীদের ওপর সুদৃঢ় থেকে শির্কমুক্ত থাকে তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া।

সত্য মা‘বুদ: তিনিই সত্য মা‘বুদ, অন্তর যার ইবাদত করে, যার ভালোবাসায় অন্তর ভরে যায়, অন্যের ভালোবাসার প্রয়োজন পড়ে না। যার আশা আকাঙ্খাই

অন্তরের জন্য যথেষ্ট, অন্যের কাছে আশা ও আকাংখার প্রয়োজন হয় না। যার নিকট চাওয়া পাওয়া, সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁকে ভয়-ভীতি করাই অন্তরের জন্য যথেষ্ট। অন্য কারো কাছে চাওয়া পাওয়ার প্রার্থনা করা, কাউকে ভয়-ভীতি করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٦٢﴾ [الحج: ٦٢]

“এটা একারণেও যে, আল্লাহই সত্য, আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৬২]

আর এটাই বান্দার কর্মের দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করা। আর এটাই তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ বা ইবাদতে একত্ববাদ।

এ তাওহীদের গুরুত্ব

নিম্নের বিষয়গুলোর মাধ্যমে এ তাওহীদের গুরুত্ব ফুটে

উঠে:

(১) এ তাওহীদই দীন ইসলামের শুরু ও শেষ, জাহেরী-বাতেনী এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। আর তাই সকল রাসূল আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত ছিল।

(২) এ তাওহীদ (কায়েম) এর লক্ষ্যে আল্লাহ তা‘আলা মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন, সকল নবী রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর এ তাওহীদের কারণেই মানুষ মুমিন-কাফির, সৌভাগ্য দূর্ভাগ্যে বিভক্ত হয়েছে।

(৩) আর এ তাওহীদই বান্দাদের ওপর সর্বপ্রথম ফরয। সর্বপ্রথম এর মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করে এবং এ তাওহীদ নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করে।

তাওহীদ বাস্তবায়ন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা:

তাওহীদের বাস্তবায়ন হলো, তাওহীদকে শির্ক, বিদ‘আত ও পাপাচার মুক্ত করা।

তাওহীদকে কলুষমুক্ত করা দু’রকম:

(১) ফরয ও

(২) মুস্তাহাব।

তন্মধ্যে ফরয তাওহীদ তিন বিষয়ের মাধ্যমে হয়:

(১) তাওহীদকে এমন শির্ক থেকে মুক্ত করা, যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

(২) তাওহীদকে এমন বিদ‘আত থেকে মুক্ত করা যা তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী, অথবা মূল তাওহীদের পরিপন্থী সে বিদ‘আত যদি কুফুরী পর্যায়ের হয়ে থাকে।

(৩) তাওহীদকে এমন পাপকর্ম থেকে মুক্ত করা যা তাওহীদের (অর্জিত) পূণ্য হ্রাস করে এবং তাওহীদে কু-প্রভাব ফেলে।

আর মান্দুব (তাওহীদ) তা হলো সকল মুস্তাহাব কাজ। যেমন:

(ক) ইহসানের (ইখলাসের) পূর্ণ বাস্তবায়ন।

(খ) ইয়াকীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

(গ) আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট অভিযোগ না করে পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করা।

(ঘ) সৃষ্টজীব থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়াই যথেষ্ট মনে করা।

(চ) কিছু বৈধ উপকরণ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের প্রকাশ। যেমন, ঝাড় ফুঁক ও দাগ (রোগ নিরাময়ের জন্য ছেঁক লাগানো) ছেড়ে দেওয়া।

(ছ) নফল ইবাদত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণ ভালোবাসা লাভ করা।

অতঃপর যারা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করবে উপরের বর্ণনানুপাতে এবং বড় শির্ক থেকে বেঁচে থাকবে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করা থেকে পরিত্রান লাভ করবে।

আর যারা বড় ও ছোট শির্ক করা থেকে বেঁচে থাকবে এবং বড় ও ছোট পাপ থেকে দূরে থাকবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা করেন (তার অন্যান্য অপরাধ) তিনি ক্ষমা করে দেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করেনা,তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।” [সূরা আল- আন‘আম, আয়াত: ৮২]

তাওহীদের বিপরীত শির্ক, আর তা তিন প্রকার:

(১) বড় শির্ক, যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী, আল্লাহ

শির্কের গোনাহ্ তাওবাহ্ ছাড়া মাফ করেন না। যে ব্যক্তি শির্কের ওপর মারা যাবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

শির্ক হল, আল্লাহর ইবাদতে কাউকে তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করে যেমনিভাবে আল্লাহকে ডাকে তেমনিভাবে সে সমকক্ষ নির্ধারণকৃতকে ডাকা, তাকে উদ্দেশ্য করে কাজ করা, তার ওপর ভরসা করা, তার কাছে কোনো কিছুর আশা করা। তাকে সে রূপ ভালোবাসা ও সে রূপ ভয় করা যেরূপ আল্লাহকে ভালোবাসে ও ভয় করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আংশিদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের

(মুশরিকদের) কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৭২]

(২) ছোট শির্ক তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। আর তা হচ্ছে, এমন প্রত্যেক মাধ্যম যা বড় শির্কের দিকে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। রিয়া বা লোক দেখানো কাজ।

(৩) গোপনীয় শির্ক, যা নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তা কখনো ছোট, আবার কখনো বড় শির্কে পরিণত হয়।

সাহাবী মাহমুদ ইবন লবীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا وماالشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال:الرياء».

“আমি তোমাদের ওপর সব চেয়েবেশী ভয় পাই ছোট শির্কের। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর

রাসূল! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন, তা হল রিয়া বা লোক দেখানো কাজ।” (আহমদ)

(২) ইবাদতের সংজ্ঞা

ইবাদত হচ্ছে, ঐ সব আকীদা-বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম যা আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। অনুরূপভাবে কোনো কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করায় তাও ইবাদত।

অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীসে বিধিবদ্ধ প্রতিটি কর্ম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত বিভিন্ন প্রকার রয়েছে:

অন্তরের ইবাদত: যেমন, ঈমানের ছয়টি রুকন, ভয়, আশা, ভরসা, আগ্রহ ও ভীতি ইত্যাদি।

প্রকাশ্য ইবাদত: যেমন, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ।

ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তা দু’টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম: সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তার সাথে শির্ক না করা। আর তাই (شهادة أن لا إله إلا الله) “আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা‘বুদ নেই” এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ٣﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২-৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينـــة: ٥]

“আর তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে (শির্কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।” [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত: ৫]

দ্বিতীয়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরী‘আত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করা।

এর অর্থ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কাজ যেভাবে করেছেন সে কাজ সেই নিয়মে করা, কোনো প্রকার কম বেশি না করা।

আর তাই (شهادة أن محمدًا رسول الله) “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল” এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [ال عمران: ٣١]

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন, আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

“আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব, তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে গ্রহণ না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

দু’টি বিষয় ছাড়া ইবাদত (দাসত্ব) পরিপূর্ণতা লাভ করে না:

প্রথম: আল্লাহকে পূর্ণ ভালোবাসা, অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসা ও আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাঁর ভালোবাসাকে অন্য সকল বস্তুর ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

দ্বিতীয়: আল্লাহর নিকট পূর্ণ বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালনের ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করবে।

সুতরাং পূর্ণ বশ্যতা, বিনয়-নম্রতা, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে পূর্ণ ভালোবাসাকে ইবাদত বলা হয়। এর মাধ্যমেই বান্দার ইবাদত স্বীয় প্রভু সৃষ্টিকর্তার জন্য বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহর জন্য ইবাদত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অতএব, বান্দার ফরয বিধান পালন করার মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করাকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

বান্দার নফল ইবাদত যতই বৃদ্ধি পাবে ততই তাঁর নৈকট্য ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাবে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় তা জান্নাতে প্রবেশ করার উপায় হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥﴾ [الاعراف: ٥٥]

“তোমরা স্বীয় রবকে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৫]

(৩) আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এর দলীল ও প্রমাণপঞ্জী:

আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদের স্বপক্ষে অজস্র সাক্ষ্য ও প্রমাণপঞ্জী রয়েছে। যারা এ প্রমাণপঞ্জীকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস আল্লাহ তা‘আলার কর্ম, নাম ও গুণাবলী এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে আরো বৃদ্ধি ও দৃঢ় করবে।

নিম্নে সে সকল সাক্ষ্য ও প্রমাণপঞ্জীর কিছু নমুনা পেশ করা হলো:

(ক) এ পৃথিবী সৃষ্টির বিশালতা, সূক্ষ্মকারীগরী, রকমারী

সৃষ্টি এবং এসব পরিচালনার সুদক্ষ নিয়ম-নীতি।

যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ সম্পর্কে তার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে।

তেমনি যে নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল, সূর্য-চন্দ্র, মানুষ-পশু, উদ্ভিদ-লতাপাতা ও জড় পদার্থ সম্পর্কে চিন্তা করবে, সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, এসবের একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি স্বীয় নামসমূহ, গুণাবলী ও উপাস্য পরিপূর্ণ, আর তাই প্রমাণ করে যে, তিনিই একমাত্র যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার প্রকৃত অধিকার রাখেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝٣١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًاۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ ۝٣٢ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝٣٣﴾ [الانبياء: ٣١، ٣٣]

“আমরা পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে

তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্ত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবই আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩১-৩৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢﴾ [الروم: ٢٢]

“তাঁর (আল্লাহর) আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২২]

(খ) আল্লাহ তা‘আলা রাসূলদের যে শরী‘আত দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন ও

অকাট্য প্রমাণাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এসব প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একমাত্র যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের জন্য যে সব নিয়ম-বিধান প্রনয়ণ করেছে, তা প্রমাণ করে যে, এসব সেই বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় থেকে এসেছে যিনি সৃষ্টিজীবের যাবতীয় কল্যাণ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ [الحديد: ٢٥]

“আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মীযান বা মানদণ্ড; যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا

ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ۝٨٨

[الاسراء: ٨٨]

“বলুন, যদি মানব ও জিন্ন এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য এক হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]

(গ) ফিৎরাত (সৃষ্টিগত স্বভাব বা প্রকৃতি) যার ওপর আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, তা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে। ফিৎরাত অন্তরের স্থায়ী জিনিস, তাই যখন কোনো মানুষ কষ্ট পায় তখন তা অনুভব করতে পারে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। মানুষ যদি সন্দেহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণমুক্ত হয়, যা ফিৎরাতকে পরিবর্তন করে দেয়, তবে সে অন্তরস্থল থেকে নাম, গুণ ও ইবাদত প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিবে এবং আল্লাহ তা‘আলা রাসূলদেরকে যে শরী‘আত দিয়ে

প্রেরণ করেছে তাতে আত্মসমর্পন করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠ ۞مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١﴾ [الروم: ٣٠، ٣١]

“তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। সকলেই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০-৩১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسنون فيها من

جدعاء»

“প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নীপূজক বানায়। যেমন, নিখুঁত জানোয়ার নিখুঁত বাঁচ্চা জন্ম দেয়। তাতে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকে না।

অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾ [الروم: ٣٠]

“এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০]

দ্বিতীয় রুকন: ফিরিশতাদের ওপর ঈমান

(১) ফিরিশতাদের পরিচয়

ফিরিশতাদের ওপর ঈমান হচ্ছে এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা‘আলার অনেক ফিরিশতা রয়েছেন। তিনি তাদেরকে নূর (জ্যোতি) থেকে সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টিগতভাবে তারা আল্লাহর অনুগত। তারা কখনও আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হন না, বরং যা আদিষ্ট হন তা পালন করেন। তারা দিবা-রাত্রি আল্লাহর তাসবীহ্ (পবিত্রতা) বর্ণনায় রত, কখনও ক্লান্ত হন না। তাদের সংখ্যা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কেউ জানে না। আর আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার (কর্মের) দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ﴾ [البقرة: ١٧٧]

“বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর , শেষ দিবসের ওপর এবং ফিরিশতাদের ওপর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭

তিনি আরো বলেন,

﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

“সকলেই ঈমান রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫]

জিবরীল ‘আলাইহিস সালামের প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে, যখন জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে তখন জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম বলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুন, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره»

“ঈমান হলো, আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনা।”

ইসলামে ফিরিশতাদের প্রতি ঈমানের স্থান ও তার বিধান:

ফিরিশতাদের ওপর ঈমান আনা, ঈমানের ছয়টি রুকনের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ।

ফিরিশতাদের ওপর ঈমান আনা ছাড়া কোনো ব্যক্তির ঈমান সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্মানিত ফিরিশতাদের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার ওপর সকল মুসলিম একমত। যারা সকল ফিরিশতাদের অথবা তাদের আংশিকের অস্তিত্বকে, যাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তাদের কাউকে অস্বীকার করবে তারা কুফুরী করলো এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦﴾ [النساء: ١٣٦]

“যে আল্লাহ তা‘আলাকে, তাঁর ফিরিশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬]

(২) ফিরিশতাদের ওপর ঈমান আনার পদ্ধতি

ফিরিশতাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা।

সংক্ষিপ্ত ঈমান নিম্নের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম: তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা, তারা আল্লাহর সৃষ্টজীব, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের অস্তিত্ব প্রকৃত, তাদেরকে আমাদের না দেখা, তাদের অনুস্তিত্বের অর্থে নয়, কারণ পৃথিবীতে অনেক সুক্ষ্ম সৃষ্টজীব রয়েছে, তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না, অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দু’বার দেখেছেন।

কতিপয় সাহাবী কিছু ফিরিশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল তার মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস্ সালামকে তার নিজস্ব আকৃতিতে ছয় শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন। প্রত্যেক পাখা একেক প্রান্ত ঢেকে রেখেছে। জিবরীলের প্রসিদ্ধ হাদীস, যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, জিবরীল আলাইহিস সালাম মানুষের আকৃতিতে ধবধবে সাদা পোষাকে, মিশ মিশ কালো চুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলেন। তাঁর উপর ভ্রমণের কোনো নিদর্শন ছিল না। সাহাবাদের কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি।

দ্বিতীয়: আল্লাহ তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে সেই সম্মান দেওয়া। তারা আল্লাহর বান্দা বা দাস। আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদের

মর্যাদাকে উঁচু করেছেন এবং তাদেরকে নৈকট্য দান করেছেন। তাদের কেউ কেউ আল্লাহর ওহি ইত্যাদির রাসূল বা দূত। আল্লাহ তাদেরকে যতটুকু ক্ষমতার মালিক করেছেন, তারা ততটুকু ক্ষমতারই মালিক। তারপরও তারা তাদের নিজেদের ও অন্যদের লাভ-ক্ষতির মালিক নয়। এই জন্য আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে এ রুবুবিয়াতের বা প্রভুত্বের গুণে গুণান্বিত করা তো দূরের কথা, যেমন- নাসারারা রূহুল কুদ্দুস সম্পর্কে ধারণা করেছে, বরং তাদের জন্যে ইবাদতের কোনো অংশ প্রদান করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۚ بَلۡ عِبَادٞ مُّكۡرَمُونَ ٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ ٢٧﴾ [الانبياء: ٢٦، ٢٧]

“তারা বলল, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও তা উচিৎ নয়। বরং তারা (ফিরিশতারা) তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে

না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৬-২৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦﴾ [التحريم: ٦]

“তারা আল্লাহ তা‘আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর ওপর এতটুকু ঈমান আনা ওয়াজিব। তাদের ওপর অপরিহার্য যে, তা জানবে ও বিশ্বাস করবে। কেননা এ বিষয়ে অজ্ঞতা কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর বা কারণ নয়।

আর ফিরিশতাদের প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথমত: ফিরিশতাদের সৃষ্টির মূল উৎস

আল্লাহ তা‘আলা ফিরিশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন, জিন্ন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আদম সন্তানদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের সৃষ্টি হলো আদম আলাইহিস্ সালাম এর সৃষ্টির পূর্বে।

হাদীসে এসেছে,

«خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم».

“ফিরিশতারা নূর থেকে, জিন্নেরা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে, আর আদম আলাইহিস সালাম মাটি থেকে সৃষ্ট। (সহীহ মুসলিম)

দ্বিতীয়ত: ফিরিশতাদের সংখ্যা

ফিরিশতারা সৃষ্টজীব, তাদের আধিক্যের জন্যে আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউ জানে না। আকাশে প্রতি চার আংগুল পরিমাণ জায়গায় একেক জন

ফিরিশতা স‌াজদারত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন। সপ্তম আকাশে বায়তুল মা‘মুরে সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রত্যহ প্রবেশ করছেন। তাদের আধিক্যতার জন্যে দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না।

কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশতা হবে, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَۚ﴾ [المدثر: ٣١]

“আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩১]

হাদীসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أطَّت السماء وحق أن تئطَّ، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد وراكع»

“আকাশ গর্জন করছে, আর গর্জন করারই কথা। কারণ, প্রত্যেক জায়গায় সাজদাহকারী ও রুকুকারী ফিরিশতা রয়েছে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইতুল মা‘মুর সম্পর্কে বলেন,

«يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه».

“বাইতুল মা‘মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করেন, তারা দ্বিতীয়বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

«يؤتي بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام، مـع كل زمـام سـبعون ألف ملك».

“জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে, সে দিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশতা হবে।” (সহীহ মুসলিম)

এখানে ফিরিশতাদের এক বিরাট সংখ্যা প্রকাশিত হল। যারা প্রায় (৭০০০০□৭০০০০=) ৪৯০ কোটি জন ফিরিশতা। তবে বাকী ফিরিশতাদের সংখ্যা কত হতে পারে? পবিত্রতা সেই সত্তার; যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে পরিচালনা করেন। তাদের সংখ্যা পরিসংখ্যান করে রেখেছেন।

তৃতীয়ত: ফিরিশতাদের নাম

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্যে যে সকল ফিরিশতাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিনজন:

(১) জিবরীল: তাকে জিবরাঈলও বলা হয়। তিনিই রুহুল কুদুস, যিনি ওয়াহী- যা অন্তরের সুধা-নিয়ে রাসূলগণের নিকট অবতরণ হন।

(২) মিকাঈল: তাকে প্রশান্তি বলা হয়। বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত, যা জমির জীবিকাস্বরূপ। আল্লাহ যেখানে বর্ষণের আদেশ দেন সেখানে বর্ষণ পরিচালনা করেন।

(৩) ইসরাফীল: তিনি শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। যা পার্থিব জীবন শেষে পারলৌকিক জীবন শুরু হওয়ার ঘোষণাস্বরূপ এবং এর দ্বারাই (মৃত) দেহসমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

চতুর্থত: ফিরিশতাদের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য

ফিরিশতারা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজীব। তাদের প্রকৃত শরীর রয়েছে যা সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণে গুণান্বিত, নিম্নে তাদের কিছু গুণ বর্ণনা করা হলো:

(ক) তাদের সৃষ্টি মহান এবং তাদের শরীর হলো বিশাল আকৃতির:

আল্লাহ তা‘আলা ফিরিশতাদেরকে শক্তিশালী ও বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা

তাদেরকে আসমান ও জমিনে যে বড় বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তারা তার উপযোগী।

(খ) তাদের ডানা রয়েছে:

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের জন্যে দুই, তিন ও চার বা ততোধিক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন, তার নিজস্ব আকৃতি ছয়শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায়। যা আকাশের প্রান্তভাগ ঢেকে রেখেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ جَاعِلِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُۚ﴾ [فاطر: ١]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং ফিরিশতাদেরকে করেছেন কর্তা বাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি

সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।” [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১]

(গ) তাদের পানাহার প্রয়োজন হয় না:

আল্লাহ তা‘আলা ফিরিশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পানাহারের মুখাপেক্ষী নন। তারা বিবাহ করেন না, সন্তানও হয় না।

(ঘ) ফিরিশতারা অন্তরবিশিষ্ট ও জ্ঞানী:

তাঁরা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারা আদম ও অন্যান্য নবীদের সাথেও কথা বলেছেন।

(ঙ) তাদের নিজস্ব আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে:

আল্লাহ স্বীয় ফিরিশতাদেরকে পুরুষ মানুষের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এতে রয়েছে মূর্তিপূজকদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন। যারা ধারণা করে যে ফিরিশতারা আল্লাহর মেয়ে বা কন্যা। তাদের

আকৃতি ধারনের পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। তবে তারা এমন সুক্ষ্ম আকৃতি ধারণ করে যে তাদের ও মানুষের মাঝে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

(চ) ফিরিশতাদের মৃত্যু:

মালাকুল মাউত বা জান কবজকারী ফিরিশতা সহ সকল ফিরিশতা কিয়ামত দিবসে মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করার জন্য পুনরুথ্যান করা হবে।

(ছ) ফিরিশতাদের ইবাদত:

ফিরিশতারা আল্লাহর অনেক ধরণের ইবাদত করেন। সালাত, দো‘আ, তাসবীহ, রুকু, সাজদাহ, ভয়-ভীতি ও ভালোবাসা ইত্যাদি। তাদের ইবাদতের বর্ণনা নিম্নরূপ:

(১) তারা ক্লান্তহীনভাবে আল্লাহর ইবাদতে সর্বদা রত থাকেন।

(২) তারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তা‘আলার জন্যে ইবাদত করেন।

(৩) তারা নাফারমানী বর্জন করে সর্বদা আনুগত্যে মাশগুল থাকেন; কেননা তারা মা‘সুম অর্থাৎ নাফারমানী ও পাপাচার থেকে মুক্ত।

(৪) অধিক ইবাদত করার সাথে সাথে আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ ۝٢٠﴾ [الانبياء: ٢٠]

“তারা রাত্রি-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে, তারা ক্লান্ত হয় না।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২০]

পঞ্চমত: ফিরিশতাদের কর্মসমূহ:

ফিরিশতারা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। সে কাজগুলো নিম্নরূপ:

(১) ‘আরশ বহন করা।

(২) রাসূলগণের ওপর অহী অবতীর্ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা।

(৩) জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারাদার।

(৪) উদ্ভিদ, বৃষ্টি বর্ষণ ও বাদল পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৫) পাহাড়-পর্বতের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৬) শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা।

(৭) আদম সন্তানের কর্ম লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৮) আদম সন্তানকে হিফাযত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ যখন আদম সন্তানের ওপর কোনো কাজ নির্ধারণ করেন, তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন তা সংঘটিত হয়।

(৯) মানুষের সাথে থাকার ও তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বানের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(১০) জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার, মানুষের (দেহে) অন্তরে আত্মা প্রক্ষেপ, তার রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য লিপিবদ্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা।

(১১) মৃত্যুর সময় আদম সন্তানের আত্মা কবজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা।

(১২) মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(১৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাঁর উম্মতের সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত। তাই মুসলিম ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তার সালাম প্রেরণের জন্য তাঁর কাছে (তাঁর কবরের কাছে) ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না; বরং পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে তাঁর ওপর সালাম ও দ‍ুরুদ পাঠ করাই যথেষ্ট। কারণ, ফিরিশতারা তার সালাম পৌঁছিয়ে দেন। মসজিদে নববীতে একমাত্র সালাত আদায়ের উদ্দেশে ভ্রমণ করা বৈধ রয়েছে।

উল্লিখিত প্রসিদ্ধ কাজসমূহ ব্যতীত তাদের (ফিরিশতাদের) আরো অনেক কাজ রয়েছে। নিম্নে এর প্রমাণ বর্ণিত হলো:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [غافر: ٧]

“যারা ‘আরশ বহন করে এবং যারা তার চার পাশে আছে, তারা তাদের রবের স-প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلۡ مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّجِبۡرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلۡبِكَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧]

“আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হয়; যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৯৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ﴾ [الانعام: ٩٣]

“যদি আপনি দেখেন যখন যালিমরা মৃত্যু-যন্ত্রনায় থাকে এবং ফিরিশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯৩]

ষষ্ঠত: আদম সন্তানের ওপর ফিরিশতাদের অধিকার

(ক) তাদের ওপর ঈমান আনা।

(খ) তাদেরকে ভালোবাসা, সম্মান করা ও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা।

(গ) তাদেরকে গালি দেওয়া, মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা ও তাদেরকে নিয়ে হাস্যরস করা হারাম।

(ঘ) ফিরিশতারা যা অপছন্দ করেন তা থেকে দূরে থাকা। কারণ, আদম সন্তানরা যাতে কষ্ট পায়, তারাও তাতে কষ্ট পায়।

সপ্তমত: ফিরিশতাদের ওপর ঈমান আনার শুভ-ফলাফল

(ক) ঈমান পরিপূর্ণ হয়; কারণ তাদের ওপর ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

(খ) তাদের সৃষ্টিকর্তার মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর শক্তি ও রাজত্বে জ্ঞান অর্জন। কারণ, সৃষ্টিকর্তার, শ্রেষ্ঠত্ব হতে সৃষ্টি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

(গ) তাদের গুণাগুণ, তাদের অবস্থা ও কর্ম জানার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা যখন মুমিনদেরকে ফিরিশতা দিয়ে হিফাযত করেন, তখন মুমিনদের শান্তি ও তৃপ্তি অর্জন হয়।

(ঙ) ফিরিশতাদেরকে ভালোবাসা: তাদের ইবাদত সঠিক পন্থায় হওয়ায় ও মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।

(চ) খারাপ ও নাফরমানীপূর্ণ কাজকে অপছন্দ করা।

(ছ) আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের গুরুত্ব দেন এ জন্য তাঁর প্রশংসা করা। যেমন, আল্লাহ ঐ সকল ফিরিশতাদের কাউকে বান্দাদেরকে হিফাযতের ও কর্ম লিখার ইত্যাদি কল্যাণজনক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

তৃতীয় রুকন: আসমানী গ্রন্থসমূহের ওপর ঈমান

রাসূলগণের প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনা ঈমানের তৃতীয় রুকন বা মৌলিক অঙ্গ।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাদের ওপর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, মাখলুকাতের হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ; যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যশালী হয় এবং যাতে তাদের চলার একটি সুন্দর পথ হয়। আর মানুষ যে বিষয়ে মতনৈক্যে লিপ্ত তার সমাধানকারী বা ফায়সালাকারী হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ [الحديد: ٢٥]

“অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ

করেছি কিতাব ও মীযান (মানদন্ড); যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]

“সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা নবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৩]

(১) কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার মূলকথা:

কিতাবসমূহের ওপর ঈমান হচ্ছে, এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে। যা তিনি তাঁর রাসূলগণের ওপর নাযিল

করেছেন। আর তা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বাণী। আর তা হল জ্যোতি ও হিদায়াত। আর নিশ্চয় এ কিতাবসমূহের মধ্যে যা রয়েছে তা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ, এর অনুসরণ করা ও তদানুযায়ী আমল করা ফরয। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ কিতাবসমূহের সংখ্যা কেউ জানে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপথন করেছেন যথাযথভাবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة:٦]

“আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে

আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬]

(২) কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার বিধান:

সকল কিতাবের ওপর ঈমান আনা যা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ তা'বারাকা ও তা'আলা সত্যিকার অর্থে কিতাবসমূহের মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং তা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অবতীর্ণ, মাখলুক বা সৃষ্ট নয়, আর যে ব্যক্তি কিতাবসমূহ অথবা তাঁর কিছুকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١٣٦﴾ [النساء: ١٣٦]

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর

কিতাবের ওপর, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রাসূলের ওপর এবং সে সমস্ত কিতাবের ওপর যেগুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইতোপূর্বে। যে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং রাসূলগণের ওপর ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান আনবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥﴾ [الأنعام: ١٥٥]

“এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং তার তাকওয়া অবলম্বন কর; যাতে তোমরা করুনাপ্রাপ্ত হও।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৫]

(৩) এসব কিতাবের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অবতীর্ণ করার পিছনে হিকমাত বা রহস্য:

প্রথমত: যাতে রাসূলের ওপর অবতীর্ণ কিতাব তাঁর উম্মাতের জন্য জ্ঞানকোষস্বরূপ হয়। ফলে তারা তাদের দীন সম্পর্কে জানার জন্যে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয়ত: যাতে রাসূলের ওপর অবতীর্ণ কিতাব তাঁর উম্মাতের প্রত্যেক মতনৈক্যপূর্ণ বিষয়ে ইনসাফভিত্তিক বিচারক হয়।

তৃতীয়ত: যাতে অবতীর্ণ কিতাব রাসূলের ইন্তেকালের পর দীন সংরক্ষণকারী হিসেবে দাঁড়াতে পারে, স্থান ও কালের যতই দুরত্ব হোক না কেন। যেমন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী দাওয়াতের অবস্থা।

চতুর্থত: যাতে এ অবতীর্ণ কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে হুজ্জাত তথা পক্ষ বিপক্ষের দলীলস্বরূপ হয়। যেন সৃষ্টজীব এ কিতাবসমূহের বিরোধিতা করা এবং এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা না করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]

“সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা নবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৩]

(৪) কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার নিয়ম:

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা যায়।

সংক্ষিপ্ত ঈমান: এ ঈমান আনা যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণের ওপর অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

বিস্তারিতভাবে ঈমান:

- এ ঈমান আনা যে, আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমে যে সকল কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন, তার ওপর ঈমান আনা। তা থেকে আমরা জেনেছি কুরআন, তাওরাত, যাবুর, ইনজীল এবং ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিম◌াস সালাম◌ের প্রতি অবতীর্ণ পুস্তিকাসমূহ।
- আরো ঈমান আনা যে, ঐ সকল কিতাব ছাড়াও আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে, যা তিনি তাঁর নবীগণের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া ঐ সকল কিতাবের নাম ও সংখ্যা কেউ জানে না।
- আরও ঈমান আনা যে, এ কিতাবগুলো অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় সৎকর্ম ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার নিমিত্তে সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়ন এবং পৃথিবী থেকে শির্ক ও অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করার জন্য। মূলত সকল

নবীদের দাওয়াত এক মূলনীতির (তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক বর্জনের) ওপর ছিল, যদিও তারা নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধানে কিছুটা ভিন্ন রকম ছিলেন।

- এ ঈমানও রাখা যে, পূর্ববর্তী রাসূলদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আল-কুরআনের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো, তা অন্তরে ও মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুরআনে যা রয়েছে তা অনুসরণ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

“রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও। সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ﴾ [الاعراف: ٣]

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩]

পূর্ববতী কিতাবের চেয়ে কুরআনের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(১) আল-কুরআন স্বীয় শব্দ, অর্থ এবং ওতে যে জ্ঞান ও পার্থিব তথ্য রয়েছে তা সর্ববিষয়ে এক অলৌকিক শক্তি।

(২) আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যেমন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দ্বারা সকল রিসালাতের

পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(৩) সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে আল্লাহ কুরআনকে হিফাযত করবেন। আর তাই অন্যান্য কিতাব থেকে তা স্বতন্ত্র। কেননা সে সব কিতাবে বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে।

(৪) আল-কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষণকারী।

(৫) কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের রহিতকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١١١﴾ [يوسف: ١١١]

“এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা ঈমান রাখে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়াত।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১]

(৫) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংবাদ গ্রহণ করা:

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকটে অহীর মাধ্যমে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তা গ্রহণ করবো। কারণ তা বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকট যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন সেভাবে নেই। পূর্ববর্তী কিতাব থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কিতাবে (কুরআনে) যে সংবাদ দিয়েছেন তা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, ‘কেউ কারও গুনাহ বহন করবে না। মানুষ তাই পায় যা সে করে, তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ لَمۡ يُنَبَّأۡ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٦٣ وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ٧٣ أَلَّا
تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٨٣ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٩٣ وَأَنَّ

سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ ۝٤٠ ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ ۝٤١﴾ [النجم: ٣٦، ٤١]

"তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইব্রাহীমের কিতাবে যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? কিতাবে আছে যে, কেউ কারও গোনাহ বহন করবে না এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ-প্রতিদান দেয়া হবে।" [সূরা আন-নজম, আয়াত: ৩৬-৪১]

তিনি আরো বলেন,

﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ۝١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ۝١٧ إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ۝١٨ صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝١٩﴾ [الاعلا: ١٦، ١٩]

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৬-১৯]

পূর্ববর্তী কিতাবের বিধান: কুরআনে যে সকল বিধান রয়েছে তা মেনে চলা আমাদের অপরিহার্য। তবে পূর্ববর্তী কিতাবে যা রয়েছে তা নয়। কারণ আমরা দেখবো পূর্ববর্তী কিতাবে যে বিধান রয়েছে তা যদি আমাদের শরী‘আতের পরিপন্থী হয়, তবে আমরা তা আমল করবো না, তা বাতিল এ জন্যে নয় বরং তা সে সময় সত্য ছিল এখন তা আমল করা আমাদের ওপর অপরিহার্য নয়। কারণ, তা আমাদের শরী‘আত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি তা আমাদের শরী‘আতের অনুরূপ হয়, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। আমাদের শরী‘আত তা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(৬) কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা হলো:

(১) কুরআনে কারীম: কুরআন হলো আল্লাহর বাণী যা তিনি শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন।

কুরআন সর্বশেষ অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ কুরআনকে বিকৃতি ও পরির্বতন থেকে হিফাযত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন এবং সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারী করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩﴾ [الحجر: ٩]

“আমরা স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: ٤٨]

“আর আমরা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন

তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮]

(২) তাওরাত: তাওরাত ঐ কিতাব যাকে আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামের ওপর নূর (জ্যোতি) ও হিদায়াতস্বরূপ নাযিল করেছিলেন। বনী ইসরাঈলের নবী ও আলেমগণ এর দ্বারা ফায়সালা করতেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালামের ওপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাত-এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, বর্তমান তথাকথিত ইয়াহূদীদের হাতে বিকৃত তাওরাতের ওপর নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤]

“নিশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে, আল্লাহর আনুগত্যশীল নবী, আল্লাহভক্ত ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের

ফায়সালা দিতেন। কেননা তাদেরকে আল্লাহর এই গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৪]

(৩) ইঞ্জীল: ইঞ্জীল ঐ কিতাব যা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করেছিলেন, যা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। সুতরাং ঐ ইঞ্জীলের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, যা সঠিক মূলনীতিসহ আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করেছিলেন। খৃষ্টানদের নিকট বিকৃত ইঞ্জীলসমূহের ওপর নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٤٦﴾ [المائدة: ٤٦]

“আর আমরা তাদের পেছনে মারিয়ামের পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান

করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের-সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশবানী।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৬]

তাওরাত ও ইঞ্জীলে যা রয়েছে তন্মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তাদের নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ

দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ, আর তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়েছেন এবং সে বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]

(৪) যাবুর: যাবুর ঐ কিতাব যা আল্লাহ দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর ওপর নাযিল করেছিলেন। সুতরাং ঐ যাবুরের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব যা আল্লাহ দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করেছিলেন। সে যাবুর নয় যা ইয়াহূদীরা বিকৃত করে ফেলেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ۝٥٥﴾ [الاسراء: ٥٥]

“আর দাউদকে দান করেছি যাবুর।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৩, সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৫]

(৫) ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিস সালামের সুহুফ বা পুস্তিকাসমূহ: তা ঐ সকল পুস্তিকা যা আল্লাহ ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিস্ সালামকে দিয়েছিলেন। কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ হয়েছে তা ছাড়া এ সকল পুস্তিকা হারিয়ে গেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ لَمۡ يُنَبَّأۡ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝٣٦ وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ۝٣٧ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ۝٣٨ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ ۝٤٠ ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ ۝٤١﴾ [النجم: ٣٦، ٤١]

“তাকে কি জানানো হয় নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে, তার দায়িত্ব পালন করেছিল? কিতাবে আছে যে, কেউ কারো গুনাহ বহন করবে না এবং মানুষ তা পায় যা সে করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।” [সূরা আন-নজম, আয়াত: ৩৬-৪১]

তিনি আরো বলেন,

﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ١٧ إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٨ صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩﴾ [الاعلا: ١٦، ١٩]

“বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। ইবরাহীম ও মূসার কিতাব বা পুস্তিকাসমূহে।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৯]

চতুর্থ রুকন: রাসূলগণের ওপর ঈমান

(১) রাসূল আলাইহিমুস সালামগণের ওপর ঈমান আনা:

আর তা ঈমানের রুকনসমূহের একটি রুকন, যার ওপর ঈমান আনা ছাড়া কোনো ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

রাসূলগণের ওপর ঈমান হলো: এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর অনেক রাসূল রয়েছে যাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাত প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছেন। যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত (সঠিক পথ) পাবে। আর যারা তাদের অনুসরণ করবে না তারা পথভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ তাদের নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রচার করেছেন। তারা অর্পিত আমানত আদায় করেছেন এবং স্বীয় উম্মাতকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। এবং যা সহ প্রেরিত হয়েছেন তার কোনো অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গোপন না করে স্বজাতির ওপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল)

কায়েম করেছেন। আল্লাহ যে সকল রাসূলদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন, আর যাদের নাম উল্লেখ করেন নাই তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো।

প্রত্যেক রাসূলই তাঁর পূর্ববর্তী রাসূল আগমণের সুসংবাদ দিতেন এবং পরবর্তী রাসূল পূর্ববতী রাসূলের সত্যায়ন করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾ [البقرة: ١٣٦]

“তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য

নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

আর যে ব্যক্তি কোনো রাসূলকে মিথ্যা জানল, সে যেন অস্বীকার করল যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল এবং যে ব্যক্তি তাঁর (রাসূলের) অবাধ্য হলো, সে মূলতঃ তাঁর অবাধ্য হলো যিনি তাকে আনুগত্যের আদেশ করেছেন। (অর্থাৎ আল্লাহর)।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য

করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অস্বীকার করি এবং এরাই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য অস্বীকারকারী। আর যারা সত্য অস্বীকারকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫০-১৫১]

(২) নবুওয়াতের হাকীকাত:

নবুওয়াত হলো: স্রষ্টা (আল্লাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে তাঁর শরী‘আত প্রচারের মাধ্যম। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন। এতে আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো প্রকার ইখতিয়ার নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ ٧٥﴾ [الحج: ٧٥]

“আল্লাহ ফিরিশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আল-হাজ্, আয়াত: ৭৫]

নবুওয়াত (আল্লাহ কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়, অধিক ইবাদত বা আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোনো নবীর ইচ্ছায় বা তাঁর চাওয়ার মাধ্যমে ও আসে না। তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নির্বাচন ও মনোনয়ন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣﴾ [الشـورا: ١٣]

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমূখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩]

(৩) রাসূল প্রেরণের হিকমত বা রহস্য:

রাসূলগণের প্রেরণের হিকমত নিম্নরূপ:

প্রথমত: বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদত করা থেকে মুক্ত

করে বান্দার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ইবাদতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বীয় রবের (আল্লাহর) স্বাধীন ইবাদতের পথ দেখানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমরা তো আপনাকে কেবল সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

দ্বিতীয়ত: যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে (মানুষকে) পরিচয় করানো।

আর সে উদ্দেশ্য হলো তাঁর একত্ববাদ বিশ্বাস ও ইবাদত করা। তা একমাত্র রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। যাদেরকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীব থেকে মনোনয়ন করেছেন এবং সকলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [النحل: ٣٦]

“আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হয় তাদেরকে) বর্জন কর।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

তৃতীয়ত: রাসূলগণকে প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের ওপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) প্রতিষ্ঠিত করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [النساء: ١٦٥]

“সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য

না থাকে, আর আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫]

চতুর্থত: কিছু গায়েবী বিষয়ের বিষয় বর্ণনা করা, যা মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না।

যেমন, আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণসমূহ এবং ফিরিশতাদের ও শেষ দিবস সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।

পঞ্চমত: যাতে রাসূলরা অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হয়; কেননা আল্লাহ তাদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে সংশয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ [الانعام: ٩٠]

“তারা এমন ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন, অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯০]

তিনি আরো বলেন,

﴿لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الممتحنة: ٦]

“তোমাদের জন্য রাসূলদের মধ্যে উত্তম আদর্শ-রয়েছে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

ষষ্ঠত: আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রকরণ এবং আত্মবিনষ্টকারী থেকে সর্তক-সাবধান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: ٢]

“তিনিই সে সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

“আমি উত্তম আদর্শ পরিপূর্ণ করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।” (আহমদ ও হাকেম)

(৪) রাসূলগণের দায়িত্বসমূহ:

রাসূলগণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, যেমন:

(ক) শরী‘আত প্রচার করা, মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত থেকে মুক্ত হওয়ার আহবান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٣٩﴾ [الاحزاب: ٣٩]

“তাঁরা (নবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৯]

(খ) দীনের অবতীর্ণ বিধান বর্ণনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ٤٤]

"আপনার কাছে আমরা উপদেশ ভাণ্ডার (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 88]

(গ) উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শণ ও অকল্যাণ থেকে সতর্ক সাবধান করা এবং তাদেরকে পূণ্যের সুসংবাদ ও তাদেরকে শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥]

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫]

(ঘ) মানুষকে কথায় ও কাজে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শবান করে তোলা।

(ঙ) আল্লাহর শরী'আত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ণ করা।

(চ) রাসূলগণের স্বীয় উম্মাতের বিপক্ষে শেষ দিবসে এ সাক্ষ্য দেওয়া যে তারা তাদের নিকট স্পষ্টভাবে দীনের দাওয়াত পৌঁছায়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا ٤١﴾ [النساء: ٤١]

"আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মাতের মধ্য থেকে সাক্ষী উপস্থাপন করব এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী উপস্থাপন করব।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪১]

(৫) ইসলাম সকল নবীদের দীন:

ইসলাম সকল নবী ও রাসূলগণের দীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দীন বা ধর্ম একমাত্র ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদত করার দিকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত বর্জন করার আহবান জানাতেন। যদি ও তাদের শরী‘আত ও বিধি-বিধান ভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু তারা সকলেই মূলনীতিতে একমত ছিলন, তা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الأنبياء إخوة لعلات»

“নবীরা একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।” (সহীহ বুখারী)

(৬) রাসূলগণ মানুষ, তারা গায়েব জানেন না:

ইলমে গাইব জানা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, নবীগণের গুণ নয়। কারণ তারা অন্যান্য মানুষের মত মানুষ। তারা পানাহার করেন, বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন, নিদ্রা যান, অসুস্থ হন ও ক্লান্ত হন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ﴾ [الفرقان: ٢٠]

“আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে বাজারে চলা ফেরা করত।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ﴾ [الرعد: ٣٨]

“আপনার পূর্বে আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৮]

তাদেরকে ও চিন্তা, দুঃখ আনন্দ ও কর্ম প্রেরণা স্পর্শ করে যেমন- সাধারণ মানুষকে পেয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দীন প্রচার করার জন্য মনোনয়ন করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে (রাসূলদেরকে ইলমে গায়েব হতে) যা অবগত করান তা ব্যতীত কোনো ইলমে গায়েব জানেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ۝٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ۝٢٧﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]

“তিনি গায়েবের জ্ঞানী, পরন্তু তিনি গায়েবের বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল

ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রেও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৬-২৭]

(৭) রাসূলগণ মা‘সূম বা নিস্পাপ:

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রিসালাত প্রদান ও প্রচার করার জন্য তাঁর সৃষ্টজীব থেকে উত্তম লোকদেরকে নির্বাচন করেছেন। যারা সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত দিক থেকে পরিপূর্ণ, আল্লাহ তাদেরকে কবীরা গুনাহ থেকে নিরাপদে রেখেছেন। সকল ত্রুটি থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছেন। যাতে তারা আল্লাহর অহী স্বীয় উম্মাতের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রিসালাত প্রচারের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে তারা যে মা‘সূম তা সর্বজনস্বীকৃত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ﴾ [المائدة: ٦٧]

“হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন,তবে আপনি তাঁর রিসালাত কিছুই পৌঁছালেন না, আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে নিরাপদে রাখবেন।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ﴾ [الاحزاب: ٣٩]

“তাঁরা (নবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿لِّيَعۡلَمَ أَن قَدۡ أَبۡلَغُواْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمۡ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدَۢا ٢٨﴾ [الجن: ٢٨]

“যাতে আল্লাহ তা‘আলা জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাদের পালনকর্তার রিসালাত পৌঁছিয়েছেন কিনা। রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সব কিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৮]

এবং যখন তাদের কারো পক্ষ থেকে এমন কোনো ছোট পাপ কর্ম প্রকাশিত হয় যা তাবলীগের (দীন প্রচারের) সাথে সম্পৃক্ত নয়, তখন তা তাদের নিকট বর্ণনা করা হলে তারা আল্লাহর কাছে তাওবাহ ও তাঁর দিকে এমনভাবে ধাবমান যেন এ পাপ তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় নি, ফলে তারা তাদের পূর্বের মর্যাদার চেয়ে আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। তা এ জন্য যে, আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে পূর্ণ সৎ চরিত্রে ও ভাল গুণে বিশেষিত করেছেন। এবং তাদের মান-মর্যাদা সুউচ্চ অবস্থান ক্ষুন্ন হয় এমন সকল জিনিস থেকে তাদেরকে পবিত্র রেখেছেন।

(৮) নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা ও তাদের মধ্যে যারা উত্তম:

রাসূলগণের সংখ্যা তিন শত দশের কিছু বেশি প্রমাণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন রাসূলগণের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন,

«ثلاثمائة وخمس عشرة جماً وغفيراً»

“তিনশত পনের জনের বিরাট এক দল।” (হাকিম)

আর নবীদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ তাদের কারোও কথা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, আর কারোও কথা বর্ণনা করেন নি। আল্লাহ তাঁর কিতাবে পঁচিশ জন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَرُسُلٗا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: ١٦٤]

“আর এমন কতক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের ইতিবৃত্ত আমরা আপনাকে বর্ণনা করেছি ইতোপূর্বে এবং এমন কতক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের বৃত্তান্ত আপনার কাছে বর্ণনা করি নি।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن
نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا
هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا
وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ
وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ
وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
﴿٨٧﴾﴾ [الانعام: ٨٣، ٨٧]

“এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমরা ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা

প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমরা তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াক‍ূব। প্রত্যেককেই আমরা পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি- তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমরা সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস, লূতকে প্রত্যেককেই আমরা সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি। আরো তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে, আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮৩-৮৭]

আল্লাহ নবীদের কাউকে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعۡضٖۖ﴾ [الاسراء: ٥٥]

“অবশ্যই আমরা নবীদেরকে কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৫]

এবং আল্লাহ রাসূলদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

“এ রাসূলগণ আমরা তাদের কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দান করেছি।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৩]

রাসূলগণের মধ্যে যারা উলুল-আযম তথা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তারা সর্ব উত্তম। তারা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ [الاحقاف: ٣٥]

“অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন, যেমন উলুল আযম (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছেন।” [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ৩৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧﴾

[الاحزاب: ٧]

“যখন আমরা নবীগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম মূসা ও মারিইয়ামের পুত্র ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আরো অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, মুত্তাকীদের ইমাম, আদম সন্তানের সরদার। নবীরা যখন একত্রিত হবেন তখন তিনি তাদের ইমাম। যখন তারা কোনো জায়গা থেকে

প্রতিনিধি দল হিসাবে আগমন করেন তখন তিনি তাদের প্রবক্তা। তিনি মাকামে মাহমুদের (প্রশংসিত স্থানের) মালিক, যে স্থানকে নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ঈর্ষা করবে।

অবতরণ স্থান, হাউয ও হামদ বা প্রশংসার ঝাণ্ডার মালিক। শেষ দিবসে সমস্ত সৃষ্টি জীবের সুপারিশকারী, জান্নাতের ওয়াসীলা নামক স্থান ও মর্যাদার মালিক। আল্লাহ তাকে তাঁর দীনের সর্বোত্তম শরী'আত বিধি-বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উম্মাতকে সর্বোত্তম উম্মতরূপে এই পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের জন্য বহু মর্যাদা ও উত্তম বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। যা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে স্বতন্ত্র। সৃষ্টির দিক দিয়ে তারা সর্বশেষ উম্মত আর পুনরুত্থানে তারা সর্বপ্রথম উম্মত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فضلت على الأنبياء بست».

“আমি ছয়টি বৈশিষ্ট্যে সকল নবীদের ওপর প্রাধান্য পেয়েছি।” (সহীহ মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة».

“আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের সর্দার, আমারই হাতে হামদের পতাকা থাকবে। এটা কোনো গর্বের বিষয় নয়। কিয়ামত দিবসে আদম ছাড়া সকলেই আমার পতাকার অধীনে থাকবে।” (তিরমিযী ও আহমদ)

মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যিনি তিনি হলেন ইবরাহীম খালীলুর রহমান। সুতরাং (আল্লাহর) দু’বন্ধু -মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উলুল আযমদের সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তিনজন (নূহ, মূসা ও ঈসা) সর্বশ্রেষ্ঠ (অন্য সব নবীদের চেয়ে)।

(৯) নবীদের মু'জিযা:

আল্লাহ তাঁর রাসূলদের সহযোগিতা করেছেন বড় বড় নিদর্শন ও উজ্জ্বল মু'জিযার (অলৌকিক শক্তির) দ্বারা। যাতে হুজ্জাত (পক্ষে-বিপক্ষে প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা প্রয়োজন পূরণ হয়।

যেমন, কুরআনুল কারীম, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, লাঠি ভয়ানক সাপে পরিণত হওয়া, ইত্যাদি।

অতঃপর মু'জিযা (স্বাভাবিক নীতি ভঙ্গকারী-অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের দালীল, আর কারামাহ্ (অলীদের জন্যও অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা সাক্ষ্যকারী প্রমাণস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ [الحديد: ٢٥]

"আমরা আমাদের রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيــاً أوحــاه إلي فــأرجو أن أكــون أكثرهم تابعاً يوم القيامة».

“প্রত্যেক নবীই নিদর্শন বা মু‘জিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন, যে মু‘জিযার মত কিছু দেখে মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা সেই অহী যা আমার নিকট (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছেন। ফলে আমি আশাবাদী যে, কিয়ামত দিবসে তাদের চেয়ে আমার অনুসারী বেশি হবে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

(১০) আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান:

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনা ঈমানের মূলনীতিসমূহের একটি অন্যতম মূলনীতি। এর ওপর ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَعِيرٗا ١٣﴾ [الفتح: ١٣]

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أمرت أن أقاتـل الناس حـتى يشـهدوا أن لا إلا إله إلا الله وإني رسول الله».

“আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে মানুষের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা-আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা‘বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দিবে।” (সহীহ মুসলিম)

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে:

প্রথমত: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম, হাশিম কুরাইশ বংশ, আর কুরাইশ আরব বংশ আর আরব ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-খালীল এর বংশধর, তাঁর ও আমাদের নবীর ওপর সর্ব উত্তম দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক। তাঁর তেষট্টি বছর বয়স হয়েছিল। নবুয়াতের পূর্বে চল্লিশ বৎসর, নবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর।

দ্বিতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা, যে বিষয় তিনি আদেশ করেছেন, তার অনুসরণ করা। যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। তিনি যে বিধান দান করেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

তৃতীয়ত: তিনি জ িন ্ন ও ইনসান সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এ কথার বিশ্বাস রাখা।

সবাইকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“আপনি বলুন হে মানবসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

চতুর্থত: তাঁর রিসালাতের ওপর ঈমান আনা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ﴾ [الاحزاب: ٤٠]

“তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪১]

এবং তিনি আল্লাহর খালীল ও আদম সন্তানের সর্দার বা নেতা। তিনি মহান শাফা‘আতের মালিক এবং জান্নাতে সুউচ্চ ওসীলা নামক স্থান তাঁরই জন্য। তিনি

কাউসারের মালিক। তাঁর উম্মাত সর্বশ্রেষ্ঠ বা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ﴾ [ال عمران: ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যা মানুষের (কল্যাণের) জন্য সৃজিত হয়েছে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০]

অধিকাংশ জান্নাতবাসী হবে তাঁরই উম্মত এবং তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিতকারী।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ তাঁকে মহান মু'জিযা ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। তা হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন; আল্লাহর বাণী, যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨﴾ [الاسراء: ٨٨]

“বলুন, যদি মানব ও জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়,তবুও তারা এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“আমরা স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমরা নিজেই এর সংরক্ষক।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

ষষ্ঠত: নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাত প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। সকল প্রকার কল্যাণের সন্ধান দিয়েছেন ও তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল প্রকার অকল্যাণ হতে তাঁর উম্মাতকে

নিষেধ করেছেন ও তা থেকে তাদেরকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨]

“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে-দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذر أمته من شرما يعلمه لهم».

“আমার উম্মাতের পূর্বে আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল নিজ উম্মাতের জন্য যা কল্যাণকর তাদেরকে তার সন্ধান দেওয়া। আর যা কল্যাণকর নয় তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করা।” (সহীহ মুসলিম)

সপ্তমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা ও তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জানের ও সকল সৃষ্টিজীবের ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। তাঁকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, ইহতেরাম করা ও তাঁর আনুগত্য করা। নিশ্চয় এটা সে হক্ক বা অধিকার যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সাবস্ত করেছেন। কারণ তাঁর ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عمران: ٣١]

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».

“তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার ছেলে সন্তান, পিতামাতা ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অষ্টমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ ও সালাম বেশি বেশি পাঠ করা। কারণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ হওয়ার পরও তাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ [الاحزاب: ٥٦]

“আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর ওপর দুরুদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর ওপর দুরুদ ও সালাম পাঠ কর।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً».

“যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার ওপর এর বিনিময়ে দশবার দুরুদ পাঠ করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

নিম্নের স্থানগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সালাতের তাশাহুদে, বিতির সালাতের কুনুতের দো‘আয়, জানাযার সালাতে, জুমু‘আর খুৎবাতে। আযানের পর, মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়। দো‘আর সময় এবং যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করা হয়, আরো অন্যান্য স্থানে।

নবমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবী তাদের প্রভ‍ূর নিকট জীবিত। শহীদদের কবরের জীবন থেকে তাদের কবরের জীবন আরো বেশি পরিপূর্ণ ও উচ্চ। তবে তাদের কবরের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মত নয়। তা এমন জীবন যার বিবরণ সম্পর্কে আমরা জানি না, সে জীবন তাদের থেকে মৃত্যুর নামও দূর করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

“আল্লাহ জমিনের জন্য নবীদের লাশ ভক্ষণকে হারাম করে দিয়েছেন।” (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«ما من مسلم يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي كي أرد عليه السلام».

“যখনই কোনো মুসলিম আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ আমার রুহ্ বা আত্মা আমার নিকট ফিরিয়ে দেন তার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য।” (আবূ দাউদ)

দশমত: তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উচু আওয়াজ না করা, অনুরূপ তাঁর কবরে তাঁর ওপর সালাম দেওয়ার সময় উচু আওয়াজ না করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহতেরামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ٢﴾ [الحجرات: ٢]

“হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর-উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম

নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ২]

দাফনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্মান করার ন্যায়। সুতরাং তাঁকে আমরা সেভাবে সম্মান করবো যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন। কারণ, তারা সকল মানুষের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক অনুসরণকারী ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করা থেকে এবং দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু দীনের মাঝে সংযোজন করা থেকে অধিক দূরে থাকতেন।

একাদশতম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে, পরিবার-পরিজনকে ও স্ত্রীদেরকে ভালোবাসা ও তাদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। তাদের মর্যাদাহানী হতে বা তাদেরকে গালী দেওয়া থেকে ও তাদের চরিত্রে কোনো প্রকার আঘাত

হানা থেকে সাবধান থাকা। কারণ, আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন ও তাদেরকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহচর হিসেবে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের ওপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لـو أنفـق أحـدكم مثـل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

“তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালী দিও না, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, তবুও তাদের এ বিশাল ব্যয় সাহাবাদের আল্লাহর রাস্তায় এক মুদ (প্রায় ৭০০ গ্রাম) বা অর্ধ মুদ ব্যয় করার সমান হবে না।” (সহীহ বুখারী)

সুতরাং পরবর্তী লোকদের উচিৎ সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজেদের মনে তাদের ব্যাপারে যাতে কোনো প্রকার কুটিলতা না থাকে এ জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

“যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, আপনি দয়ালু পরম করুণাময়।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

দ্বাদশতম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, অতিরঞ্জিত করা তাঁকে বড় কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা থেকে ও তাঁর প্রশংসা করার সময় সীমালংঘন করা থেকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁকে তার চেয়ে মর্যাদা দেওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। কারণ, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تر فعوني فـوق منزلتي»

“আমি একজন বান্দা বা দাস। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল বল। তোমরা আমাকে আমার মর্যাদার চেয়ে উ্ঁচু কর না এটা আমি ভালোবাসি না”।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم».

“তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত কর না যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছিল।” (সহীহ বুখারী)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করা ও তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা। তাঁর কবরের পাশ দিয়ে ত্বাওয়াফ করা, তাঁর নামে মান্নত মানা, পশু যবেহ করা বৈধ নয়।

এ সকল কাজ আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর, অথচ আল্লাহ অন্যের ইবাদত করা থেকে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে তাঁকে ইহতেরাম না করায় তাঁর প্রতি অনীহা প্রকাশ পায়। তাঁর মানহানি করা, তাঁকে তুচ্ছ জানা, তাঁর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, ইসলাম থেকে মুর্তাদ বা বের হয়ে যাওয়া ও আল্লাহর সাথে কুফুরী করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে? ওযর পেশ করো না, তোমরা তো কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকার ভালোবাসা, তাঁর নীতির ও সুন্নাতের অনুসরণ-অনুকরণ, তাঁর পথের বিরোধিতা না করার প্রেরণা যোগায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [ال عمران: ٣١]

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর; যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের ব্যাপারে কম-বেশি করে সীমালঙ্ঘন না করা ওয়াজিব। তাই তাঁকে ইলাহ বা মা‘বুদের গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। তাঁর মর্যাদা সম্মান ও ভালোবাসার অধিকার কমানোও যাবে না, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার

শরী‘আতের অনুসরণ করা, তার নীতির ওপর চলা ও তাঁর অনুকরণ করা।

ত্রয়োদশতম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা পূর্ণাঙ্গ হবে তাঁকে সত্যায়ন করা এবং তিনি যে শরী‘আত নিয়ে এসেছেন তার ওপর আমল করার মাধ্যমে, এটাই তাঁর আনুগত্য করার অর্থ।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর নাফরমানী বস্তুত আল্লাহরই নাফরমানী। আর তাঁকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

পঞ্চম রুকন: শেষ দিবসের ওপর ঈমান

(১) শেষ দিবসের (আখিরাতের) ওপর ঈমান

আখেরাতের ওপর ঈমান হচ্ছে, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পার্থিব জীবন শেষ হয়ে মৃত্যু ও কবর জীবনের মাধ্যমে অন্য জগত শুরু হবে। এভাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারপর পুনরুত্থান, হাশর, নাশর ও হিসাব-নিকাশের পর ফলাফল প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে।

শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনা ঈমানের রুকনসমূহের অন্যতম একটি রুকন। যার ওপর ঈমান আনা ছাড়া কোনো বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আর যে ব্যক্তি শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧]

“বরং সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর ও কিয়ামত দিবসের ওপর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭]

অনুরূপভাবে হাদীসে জিবরীল-এ এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه، ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

“জিব্রাঈল বলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান হলো, আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূল এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনা, আরো ঈমান আনা তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি।” (সহীহ মুসলিম: ১/১৫৭)

শেষ দিবসের পূর্বে কিয়ামতের যে সকল আলামত সংঘটিত হবে তার ওপর ঈমান আনা, যেগুলো সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন।

আলেমগণ এ আলামতকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ক) ছোট আলামত: যা কিয়ামত নিকটে হওয়া বুঝায়, আর তার সংখ্যাও অনেক। তন্মধ্যকার অধিকাংশ সংঘটিত না হলেও অনেকগুলো সংঘটিত হয়ে গেছে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণ। আমানতের খিয়ানত করা। মসজিদ অধিক মাত্রায় সাজ-সজ্জা ও তা নিয়ে গর্ব করা। বড় বড় অট্টালিকা নিয়ে রাখালদের গর্ব করা। ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের নিহত হওয়া। সময় নিকটবর্তী হওয়া, আমল কমে যাওয়া, ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া, অধিক হত্যা হওয়া, ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ অধিক মাত্রায় হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ١﴾ [القمر: ١]

“কিয়ামত আসন্ন ও চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। [সূরা আল-ক্বামার-আয়াত-১]

(খ) বড় আলামত: যা কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্তে সংঘটিত হবে এবং কিয়ামত শুরু হওয়ার সতর্ক করবে। এমন বড় আলামত দশটি। যার কোনো একটিও প্রকাশিত হয় নি।

বড় আলামতসমূহ হলো: ইমাম মাহদীর আগমন, দাজ্জালের আগমন, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আকাশ হতে ন্যায় বিচারক হিসাবে অবতরণ, তিনি খৃষ্টানদের ক্রুসেড ভেঙ্গে দিবেন, দাজ্জাল ও শুকুরকে হত্যা করবেন। জিযিয়া করের আইন রহিত করবেন। ইসলামী শরী‘আত অনুপাতে বিচার পরিচালনা করবেন। ইয়াজুজ, মাজুজ বের হবে। তাদের ধ্বংসের জন্য তিনি দো‘আ করবেন, অতঃপর তারা মারা যাবে। তিনটি বড় ভূমিকম্প হবে। পূর্বে একটি, পশ্চিমে একটি, জাযিরাতুল আরবে একটি। ধোঁয়া বের হবে, তা হলো আকাশ হতে প্রচণ্ড ধোঁয়া নেমে এসে সকল মানুষকে

ঢেকে নিবে। কুরআন যমীন থেকে আকাশে তুলে নেওয়া হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে। এক (অদ্ভুত) চতুস্পদ জন্তু বের হবে। ইয়ামানের আদন (জায়গার নাম) থেকে ভয়ানক আগুণ বের হয়ে মানুষদের শামের দিকে নিয়ে আসবে। এটাই সর্বশেষ বড় আলামত।

হুযাইফা ইবন আসীদ আল-গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«اطلع النبي ﷺ ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون؟» قالوا: نذكر الساعة قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات.فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها ،ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخرذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন, এমতাবস্থায় আমরা এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন তোমরা কি বিষয় আলোচনা করছ? তারা বললেন আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা তার পূর্বে দশটি আলামত সংঘটিত হতে দেখবে। অতঃপর আলামতসমূহ উল্লেখ করলেন, ধোঁয়া, দাজ্জাল, চতুস্পদ জন্তু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা ইবন মারইয়াম এর আগমন, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, তিনটি ভূমি কম্প- একটি প্রাচ্যে আর একটি পাশ্চাত্যে, আর একটি জাযিরাতুল আরবে, শেষ আলামত হল ইয়ামান থেকে আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«يخرج في آخر أمتي المهـدي، يسـقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتهـا، ويعطي المال صـحاحاً، وتكـثر الماشـية، وتعظم الأمـة، يعيش سبعاً أو ثمانياً، يعني حججاً».

“আমার উম্মাতের শেষ ভাগে ইমাম মাহদী বের হবেন, তার ওপর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষন করবেন। যমীন উদ্ভিদ জন্ম দিবে। সুস্থ্য ও সচ্ছল লোকদের মাল প্রদান করা হবে। চতুস্পদ জানোয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। উম্মাতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তিনি সাত অথবা আট বছর বসবাস করবেন। (হাকেম)

বর্ণিত আছে যে, ঐ নিদর্শনগুলো পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হবে, যেমন পুতির মালায় পুতি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে। এগুলোর একটি সংঘটিত হওয়ার পর পরই অপরটি সংঘটিত হবে। এ দশটি নিদর্শন সংঘটিত হওয়ার পর পরই আল্লাহর আদেশে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায়: কিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ দিন, যে দিন মানুষ আল্লাহর আদেশে তাদের কবর

থেকে বের হবে, হিসাব নিকাশের জন্য, অতঃপর সৎকর্মশীল সুফল ও শান্তি এবং অসৎ কর্মশীল কুফল ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوۡمَ يَخۡرُجُونَ مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ سِرَاعٗا كَأَنَّهُمۡ إِلَىٰ نُصُبٖ يُوفِضُونَ ٤٣﴾ [المعارج: ٤٣]

"সে দিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে-যেন তারা কোনো এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ৪৩]

এ দিনের একাধিক নাম কুরআনে কারীমে উল্লেখ হয়েছে। যেমন,

(يـوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ, (القارعة) আল-ক্বারি'আহ,

(يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাব, ((يوم الدين ইয়াওমুদ্দিন, (الطامة) আত্ত্বামাহ, (الواقعة) আল-ওয়াক্বি'আহ, (الحاقة) আল-হা-ক্কাহ, (الصاخة) আসসাখখাহ, (الغاشية) আল-গাশিয়াহ ইত্যাদি।

□ (يوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ ١﴾ [القيامة: ١]

“কিয়ামাত দিবসের শপথ।” [সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত: ১]

□ (القارعة) আল-ক্বারি‘আহ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلۡقَارِعَةُ ١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ٢﴾ [القارعة: ١، ٢]

“(আল ক্বারিয়াহ) করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কী? [সূরা আল-ক্বারি‘আহ, আয়াত: ১-২]

□ (يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাব: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦﴾ [ص: ٢٦]

“নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।” [সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২৬]

- (يــوم الدين) ইয়াওমুদ দিন: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ۝١٤ يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ ۝١٥﴾

[الانفطار: ١٤، ١٥]

“এবং পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহান্নামে, তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।” [সূরা আল- ইনফিতার, আয়াত: ১৪-১৫]

- (الطّامة)আত্ত্বামাহ্: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلۡكُبۡرَىٰ ۝٣٤﴾ [النازعات: ٣٤]

“অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।” [সূরা আন-নাযি‘আত, আয়াত: ৩৪]

- (الواقعة) আল-ওয়াক্বি‘আহ: আল্লাহ তা‘আলা

বলেন,

﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ١﴾ [الواقعة: ١]

“যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে।” [সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ১]

- (الحاقة) আল-হাক্কাহ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلۡحَآقَّةُ ١ مَا ٱلۡحَآقَّةُ ٢﴾ [الحاقة: ١، ٢]

“সু-নিশ্চিত বিষয়, সু-নিশ্চিত বিষয় কী? [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১-২]

- (الصّــاخة) আস-সাখখাহ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ٣٣﴾ [عبس: ٣٣]

“অতঃপর যে দিন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে।” [সূরা আবাসা-আয়াত, ৩৩]

- (الغاشــية) আল-গাশিয়াহ: আল্লাহ তা‘আলা

বলেন,

﴿هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ ۝١﴾ [الغاشية: ١]

“আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? [সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ১]

(২) শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনার নিয়ম:

শেষ দিবসের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা:

শেষ দিবসের প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনার পদ্ধতি হচ্ছে, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এমন একটি দিন রয়েছে, যে দিন আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। একদল জান্নাতী হবে, অপর দল জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَوَّلِينَ وَٱلۡأٓخِرِينَ ۝٤٩ لَمَجۡمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ۝٥٠﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]

“বলুন, নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একটি নির্ধারিত দিনে একত্রিত হবে। [সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৪৯-৫০]

আর শেষ দিবসের প্রতি বিস্তারিত ঈমান হলো, মৃত্যুর পর যা কিছু সংঘটিত হবে তার প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনা।

আর তা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমত: ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরীক্ষা, আর তা হলো, মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তাকে তার রব, দীন ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আল্লাহ সত্যের ওপর অটল রাখবেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

«ربي الله، وديني الإسلام ونبي محمد ».

“যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হবে, সে বলবে, আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম, আর আমার নবী হচ্ছেন

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করা ও তাঁর পদ্ধতি, মুমিনরা ও মুনাফিকরা কি উত্তর দিবেন এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত: কবরের শাস্তি ও শান্তি: কবরের শাস্তি ও শান্তির ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। আর নিশ্চয় কবর জাহান্নামের গর্তের একটি গভীর গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানের একটি বাগান। আর কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ বা স্টেশন। যে ব্যক্তি কবর থেকে মুক্তি পাবে (তার জন্য) কবরের পরের ধাপগুলো হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি কবর থেকে মুক্তি পাবে না তার জন্য এর পরের ধাপগুলোতে মুক্তি পাওয়া আরো কঠিন হবে। বস্তুত যার মৃত্যু হল তখন থেকে তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। অতঃপর আত্মা ও শরীর, উভয়ে কবরে শাস্তি বা শান্তি ভোগ করবে। আর কখনো কখনো শুধু আত্মা তা ভোগ করবে। আর কবরের

আযাব বা শাস্তি শুধুমাত্র যালেমদের জন্য, আর শান্তি শুধুমাত্র সত্যবাদী মুমিনদের জন্য।

আর মৃত ব্যক্তি কবর জীবনের শাস্তি অথবা শান্তি প্রাপ্ত হবে, চাই ভূগর্ভস্থ করা হোক বা না-ই হোক। যদিও মৃত ব্যক্তিকে আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়, অথবা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয় অথবা হিংস্র পশু পাখি খেয়ে ফেলে, তারপরও সে এ শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦﴾ [غافر: ٤٦]

“সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোষ্ঠীকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৪৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فلـــو لا أن لا تـــدافنوا لدعوت الله أن يســـمعكم من عـــذاب القبر».

“হায়!! যদি তোমরা (তাদেরকে) দাফন না করার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দো‘আ করতাম তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য।” (সহীহ মুসলিম)

তৃতীয়ত: শিঙ্গায় ফুৎকার: শিঙ্গা হল বাঁশীস্বরূপ; যাতে ইসরাফীল আলাইহিস সালাম ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ যা জীবিত রাখবেন তা ছাড়া সকল সৃষ্টজীব মারা যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টিজীবের আর্বিভাব হয়েছিল, তারা সকলেই উঠে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ ۝٦٨﴾ [الزمـــر: ٦٨]

“আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত। অতঃপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاً ثم لا يبقى أحد إلا صعق ،ثم ينزل الله مطرا كأنــه الطــل, فتنبت منــه أجساد الناس, ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون».

“অতঃপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে সকলেই স্কন্ধ উচু করবে। অতঃপর সকলেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাবে। তারপর আল্লাহ হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টি থেকে মানুষের দেহ তৈরি হবে। তারপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।” (সহীহ মুসলিম)

চতুর্থত: পুনরুত্থান: আর তা হলো, শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সময় আল্লাহ সকল মৃত্যদের জীবিত করবেন।

তারা সকলে সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফোঁক দেওয়া ও প্রত্যেক আত্মাকে স্ব-শরীরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলে সকল মানুষ তাদের কবর থেকে দাঁড়িয়ে জুতা বিহীন, নাঙ্গা পা, বস্ত্র-বিহীন-উলঙ্গ শরীর, খাৎনা বিহীন ও দাঁড়ি-গোঁফ বিহীন অবস্থায় দ্রুত ময়দানের দিকে ছুটে যাবে।

ময়দানের অবস্থান দীর্ঘ হবে, সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে, সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এ উত্তপ্ত ও কঠিন অবস্থান দীর্ঘ হওয়ায় শরীর থেকে নির্গত ঘামে হাবু-ডুবু খাবে, কারো ঘাম পায়ের দু' গিরা পর্যন্ত, কারো দু' হাটু পর্যন্ত, কারো মাজা পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু' কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর কেউ-সম্পূর্ণভাবে হাবুডুবু খাবে, এ সব হলো তাদের (ভালো-মন্দ) কর্ম অনুপাতে।

পুনরুত্থান সত্য ও নিশ্চিত, যা ইসলামী শরী'আহ, (কুরআন ও হাদীস) অনুভূতি শক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা প্রমাণিত।

ইসলামী শরী'আহ: এর স্বপক্ষে প্রমাণ কুরআনে অনেক আয়াত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧]

"বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে।" [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ﴾ [الانبياء: ١٠٤]

"যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتــاُ، ثم لا يبقى أحد إلا صقع، ثم ينزل الله مطراً كأنـه الطـل أو الظـل- شك الراوي- فتنبت أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فــإذا هم قيام ينظرون».

“অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সকলেই স্কন্ধ উচু করবে অতঃপর সকলেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাবে। তারপর আল্লাহ হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টি থেকে মানুষের দেহ তৈরী হবে। তারপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।” (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ ٧٨ قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ ٧٩﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]

“বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো গলে পচে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি

করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্ব প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৭৮-৭৯]

অনুভূতি: অনুভূতি থেকে পুনরুত্থানের ওপর দলীল:

আল্লাহ তা‘আলা এই পৃথিবীতে অনেক মৃতকে জীবিত করে তাঁর বান্দাদেরকে দেখিয়েছেন। আর এ বিষয়ে সূরা বাক্বারায় পাঁচটি উপমা রয়েছে,

- মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছিলেন।
- বনী ইসরাঈলের এক নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন।
- ঐ সম্প্রদায়কে জীবিত করেছিলেন, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করেছিল।
- ঐ ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন, যে ব্যক্তি জনপদ দিয়ে অতিক্রম করেছিল,
- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পাখিসমূহকে।

আক্বল: বা সুস্থ বিবেক থেকে পুনরুত্থানের দলীল:

আর তা দু'ভাবে হতে পারে:

(ক) আল্লাহ আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা রয়েছে সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আসমান যমীন প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। যিনি প্রথম সৃষ্টির ওপর ক্ষমতাবান তিনি (তাকে) পূনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে অপারগ নন।

(খ) জমিন শুষ্ক ও নির্জীব হয়ে যায়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি নাযিল করে জমিনকে সতেজ ও সজীব করে তুলেন, সর্ব প্রকার সবুজ-শ্যামল গাছ পালা উৎপন্ন হয়। সুতরাং যিনি এ মৃত জমিনকে জীবিত করতে সক্ষম তিনিই মৃতদের পূনরায় জীবিত করাতেও সক্ষম।

পঞ্চমত: হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল

আমরা ঈমান আনবো যে, সকল দেহের হাশর নাশর হবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাদের মাঝে বিচারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল সৃষ্টিজীবকে স্বীয় কৃত কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَحَشَرۡنَٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدٗا ٤٧﴾ [الكهف: ٤٧]

“আর আমরা তাদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।” [সূরা আল-ক্বাহাফ, আয়াত: ৭৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ ١٩ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ٢١﴾

[الحاقة: ١٩، ٢١]

“অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে।” [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৯-২১]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝٢٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦﴾ [الحاقة: ٢٥، ٢٦]

“অতঃপর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।” [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ২৫-২৬]

আর হাশর হচ্ছে, মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য ময়দানে একত্রিত করা।

হাশর ও পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্য: পুনরুত্থান হলো: দেহসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা। আর হাশর হলো,

পুনরুত্থিত ব্যক্তিদেরকে অবস্থান ময়দানে একত্রিত করা।

হিসাব, নিকাশ ও প্রতিফল: আল্লাহু তা‘বারাকা ও তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন ও তাদেরকে তাদের সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে অবগত করাবেন।

অতঃপর মুমিন মুত্তাকীদের হিসাব নিকাশ হলো, শুধুমাত্র তাদের নিকট তাদের কর্ম পেশ করা হবে। যাতে তারা তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, যে অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের নিকট থেকে দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলেন। আর আল্লাহ আখিরাতে তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর তাদের হাশর হবে তাদের ঈমান অনুপাতে। ফিরিশতারা তাদেরকে স্বাগত জানাবে ও জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করবে, আর তাদেরকে অস্থিরতা ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি এবং এ কঠিন দিনের ভয়াবহতা থেকে নিরাপত্তা দিবে, অতঃপর

তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। আর তাদের মুখমণ্ডল সে দিন হাসি-খুশী, আনন্দ-উৎফুল্ল সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ বিমুখ মিথ্যাবাদীদের (কাফিরদের) হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত কঠিনভাবে হবে। সুক্ষাতিসুক্ষ প্রত্যেকটি ছোট বড় কর্মের। কিয়ামত দিবসে তাদেরকে তাদের মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য ও তাদের কৃত কর্মের ফল হিসাবে এবং তাদের মিথ্যা বলার কারণে।

কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের, তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক তাদের পূর্ণ তাওহীদের বদৌলাতে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সকল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষায় যাদের গুণ বর্ণনা করেছেন, তারা কারো নিকট ঝাড়-ফুঁক অনুসন্ধান করেন নি, লৌহ জাতীয় কোনো কিছুর ছেঁক দিয়ে চিকিৎসা নেন নি। কোনো দিন কোনো কিছু

থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করেন নি। আর তারা তাদের প্রভুর ওপর-ই ভরসা করতেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন প্রসিদ্ধ সাহাবী উক্কাশা ইবন মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহর হক্ব-সালাতের (নামাযের) আর মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তপাতের।

ষষ্ঠত: হাউয

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযের ওপর ঈমান আনবো। আর তা বিশাল হাউয ও সম্মানিত অবতরণ স্থান। কিয়ামতের মাঠে জান্নাতের আল-কাউসার নামক নদী থেকে শরাব প্রবাহিত হবে। এতে অবতরণ করবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুমিন উম্মাতেরা।

হাউযের কিছু বৈশিষ্ট্য: তার শারাব দুধের চাইতে সাদা, বরফের চাইতে ঠাণ্ডা, মধুর চাইতে অধিক মিষ্টি। মিশকের চাইতে সুগন্ধি, যা সুপ্রশস্ত, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান, এর প্রতিটি প্রান্তের আয়তন এক মাসের পথের

সমান। এতে জান্নাত থেকে প্রবাহিত দু'টি নালা রয়েছে। আর এর পান-পাত্র আকাশের তারকারাজির চাইতে অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبداً».

"আমার হাউযের আয়তন এক মাসের পথ সমতুল্য, তার পানি দুধের চাইতে সাদা ও তার ঘ্রাণ মিশকের চাইতে সুগন্ধি, তার পান-পাত্র আকাশের তারকারাজির সংখ্যার ন্যায়। যে ব্যক্তি তা থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।" (সহীহ বুখারী)

সপ্তমত: শাফা'আহ

যখন সেই মহান প্রান্তরে মানুষের বিপদ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং সেথায় তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে। তখন

তারা এ প্রান্তরের ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের প্রভুর নিকট সুপারিশ পেশ করার প্রচেষ্টা চালাবে। রাসূলদের মধ্যে যারা উলুল আযম তথা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল যেমন, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালাম, তারা অপারগতা প্রকাশ করবেন, তখন সর্ব শেষ রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যার আগের ও পরের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন) তার নিকটে সবাই পৌঁছবে। তখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দাঁড়াবেন। তিনি এমন স্থানে দাঁড়াবেন যে স্থানে আগের ও পরের সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে এবং এর দ্বারা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহা সম্মান ও উঁচু মর্যাদা প্রকাশিত হবে। তারপর ‘আরশের নিচে স◌াজদায় পড়ে যাবেন, আল্লাহ তখন তাঁর নিকট আল্লাহর অনেক প্রশংসা ও উপযুক্ত আদেশ ইলহাম করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করবেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের নিকট (তাদের জন্য) সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন। আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিজীবের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করবেন; যাতে বান্দাদের মাঝে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা ভোগের পর সুষ্ঠু ফায়সালা করা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك، استغاثوا بآدم، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعسي، ثم بمحمد- ﷺ-. فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيؤمئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم».

“কিয়ামত দিবসে সূর্য নিকটে হবে। এমনকি ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারা এই অবস্থাতেই থাকবে। ফলে তারা আদম আলাইহিস সালাম, অতঃপর

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম, অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম, অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেওয়ার প্রার্থনা করবে।

অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করবেন; যাতে সৃষ্টিজীবের মাঝে ফায়সালা সুসম্পন্ন করা হয়। অতঃপর তিনি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবেন ও জান্নাতের দরজার কড়া (খোলার জন্য) ধরবেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশংসিত স্থানে অবতরণ করাবেন। সে স্থানের প্রশংসা সকলে করবে”। (সহীহ বুখারী)

এ মহান শাফা‘আত আল্লাহ একমাত্র রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক শাফা‘আতের অধিকারী হবেন।

(১) জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত।

তার প্রমাণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح،فيقول الخازن من أنت؟ قال فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك».

“আমি কিয়ামত দিবসে জান্নাতের দরজার নিকটে আসবো, দরজা খোলার অনুমতি চাবো। অতঃপর জান্নাতের প্রহরী বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তরে বলব, আমি মুহাম্মাদ, অতঃপর প্রহরী বলবে, আপনার জন্যই শুধু দরজা খোলার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার পূর্বে কারো জন্য (দরজা) খুলবো না।” (সহীহ মুসলিম)

(২) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত ঐ সকল ব্যক্তির জন্য, যাদের নেকী ও বদী বা সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান হয়ে গেছে। তাদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে তিনি শাফা‘আত করবেন। এ হচ্ছে কিছু আলেমের অভিমত। কিন্তু এ ব্যাপারে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

(৩) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত ঐ সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা জাহান্নামের অধিকারী হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামে না দেওয়ার ব্যাপারে। এর প্রমাণ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

“আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কাবীরা গোনাহ করেছে তাদের জন্য আমার শাফা‘আত।” (আবূ দাউদ)

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে শাফা‘আত যা তিনি জান্নাতে জান্নাতীদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে করবেন। তার প্রমাণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

«اللّٰهُمَّ اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين».

“হে আল্লাহ, আবূ সালামাকে মাফ কর এবং সঠিক পথপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দাও।” (সহীহ মুসলিম)

(৫) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে। এর প্রমাণ, উক্কাশাহ ইবন মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, সত্তর হাজার লোকের ব্যাপারে, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (উক্কাশাহ) জন্য দো‘আ করলেন,

«اللَّهُمَّ اجعله منهم».

“হে আল্লাহ তাকে (উক্কাশাকে) তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

(৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের মধ্যে যারা কাবীরা গোনাহ করায় জাহান্নামে প্রবেশ

করবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত। এর প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

“আমার উম্মাতের কাবীরা গোনাহকারীদের জন্য আমার শাফা'আত।” (আবূ দাউদ)

তাছাড়া এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি হাদীস হলো,

«يخرج قوم من النار بشفاعة محمد-ﷺ- فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين».

“একদল লোককে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, অতঃপর তারা জান্নাতে যাবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে নামকরণ করা হবে।” (সহীহ বুখারী)

(৭) যারা শাস্তির হক্কদার হবে তাদের শাস্তি হালকা করার ব্যাপারে তাঁর শাফা‘আত। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালেবের জন্য শাফা‘আত। এর প্রমাণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضـــاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه».

“সম্ভবত কিয়ামতের দিবসে আমার শাফা‘আত তার শাস্তি লাঘবে উপকারে আসবে, তাই শাস্তি হিসাবে শুধু পায়ের গিরা পর্যন্ত দু’টি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

তবে আল্লাহর নিকট শাফা‘আত গ্রহণ হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত রয়েছে:

(ক) শাফা‘আতকারীর ও শাফা‘আতকৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

(খ) শাফা'আতকারীর শাফা'আত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ [الانبياء: ٢٨]

"তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করার কে অধিকার রাখে? [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]

অষ্টমত: মীযান: মীযান সত্য, তার ওপর ঈমান আনা ফরয। আর সে মীযান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে স্থাপন করবেন, বান্দাদের আমল মাপার ও তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদানের জন্য। এটি বাস্তব মীযান বা মানদণ্ড, কাল্পনিক নয়, এর দু'টি পাল্লা ও রশি রয়েছে, এর দ্বারা কর্ম অথবা আমলনামা অথবা স্বয়ং কর্ম সম্পাদনকারীকে মাপা হবে। সবই মাপা হবে, তবে ওজন ভারি-হালকার বিষয়বস্তু হবে শুধু কর্ম। কর্ম সম্পাদনকারী ও আমলনামা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ۝٤٧﴾ [الانبياء: ٤٧]

"আর আমরা কিয়ামত দিবসে ন্যায়বিচারের মীযানসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি যুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমরা তা

উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহনের জন্য আমরাই যথেষ্ট।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ٩﴾ [الاعراف: ٨، ٩]

“আর সে দিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৮-৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان».

“পবিত্রতা অর্জন করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য)

বাক্যটি ওজনের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়।” (সহীহ মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«يوضع الميزان يــوم القيامــة فلــو وزن فيــه الســماوات والأرض لوسعت».

“কিয়ামত দিবসে এমন মীযান স্থাপন করা হবে, তাতে যদি সাত আসমান ও সাত যমীনও মাপা হয় তবে তাও তাতে জায়গা হবে”।

নবমত: আস-সিরাত বা পুল সিরাত:

আর আমরা পুল সিরাতের ওপর ঈমান আনবো। আর তা হলো জাহান্নামের পিঠের উপর স্থাপিত পুল, যা ভয়-ভীতি সন্ত্রস্ত অতিক্রম স্থল বা পথ। এর উপর দিয়ে মানুষ জান্নাতের দিকে অতিক্রম করবে। কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের ন্যায়। কেউ অতিক্রম করবে বিজলীর ন্যায়। কেউ বাতাসের ন্যায়। কেউ পাখির ন্যায়। কেউ ঘোড়ার ন্যায় চলবে। কেউ মুসাফিরের ন্যায়

চলবে। কেউ ঘন ঘন পা রেখে চলবে। সর্বশেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে টেনে ফেলা হবে। সকলেই অতিক্রম করবে তাদের কর্মের ফলাফল অনুপাতে। এমনকি যার আলো তার পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পরিমাণ হবে সেও অতিক্রম করবে। কাউকে থাবা মেরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পুল সিরাত অতিক্রম করতে পারবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর তাঁর উম্মাত পুলসিরাত পাড়ি দিবেন। আর সে দিন একমাত্র রাসূলগণ কথা বলবেন। রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) দের কথা হবে (اللَّهُمَّ سلم سلم) "হে আল্লাহ মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।

জাহান্নামে পুলসিরাতের দু'ধারে হুকের ন্যায় কন্টক থাকবে, এর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহ্ জানে না। সৃষ্টি-জীব থেকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে থাবা মেরে (জাহান্নামে) ফেলে দেওয়া হবে।

পুলসিরাতের কিছু বর্ণনা:

তা তরবারীর চাইতে ধারালো, আর চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও পিচ্ছিল জাতীয়। এতে আল্লাহ যাদের পা স্থির রাখবেন, শুধুমাত্র তাদেরই পা স্থির থাকবে, আর তা অন্ধকারে স্থাপিত হবে। আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে পুলসিরাতের দু'পার্শে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা হবে, যারা তা সংরক্ষণ করেছেন তাদের সপক্ষে, আর যারা সংরক্ষণ করে নি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتۡمٗا مَّقۡضِيّٗا ٧١ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيّٗا ٧٢﴾ [مريم: ٧١، ٧٢]

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (পুলসিরাতে) পৌঁছবে না, এটা আপনার রবের অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমরা তাকওয়ার অধিকারীদেরকে

উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭১-৭২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ويضرب الصراط بين ظهراني جنهم فـأكون أنـا وأمـتي أول من يجيزه».

“জাহান্নামের পিঠের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে, আর সর্বপ্রথম আমি ও আমার উম্মাত তা অতিক্রম করবো।” (সহীহ মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«ويضرب جسر جهنم..فأكون أول من يجيز ودعاء الرسـل يومئـذ اللَّهُمَّ سلم سلم».

“জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে, অতঃপর আমিই সর্বপ্রথম অতিক্রম করবো। আর সে দিন রাসূলদের দো‘আ হবে, আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম, (হে আল্লাহ! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও)।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف».

“আমি সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছি যে, পুলসিরাত চুলের চাইতে সূক্ষ্ম আর তরবারীর চাইতে ধারালো হবে।” (সহীহ মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وترسل الأمانة والرحم فتقوم على جنبي الصراط يميناً وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق... ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، تجزي بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً قال وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار».

“আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রেরণ করা হবে, অতঃপর পুল সিরাতের ডানে ও বামে দাঁড়াবে, তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা অতিক্রম করবে, তারা বিজলীর ন্যায় অতিক্রম করবে, তারপর যারা অতিক্রম

করবে তারা বাতাসের ন্যায়। তারপর পাখির ন্যায় অতিক্রম করবে, তারপর মুসাফিরের ন্যায় অতিক্রম করবে, তাদের কর্ম তাদেরকে অতিক্রম করাবে। আর তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুল সিরাতের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকবেন এবং বলবেন, হে প্রভু মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। এভাবে বান্দাদের কর্ম অপারগ হয়ে যাবে, এমন কি কিছু লোক হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করবে। পুলসিরাতের দু’ধারে ঝুলন্ত হুকের ন্যায় কন্টক থাকবে, যাদেরকে গ্রেফতার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করবে। অতঃপর কিছু আহত হয়ে মুক্তি পাবে আর কিছু চাপাচাপি করে জাহান্নামে পড়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম)

দশমত: আল-কানত্বারাহ

আমরা ঈমান আনবো এ কথার প্রতি যে, মু‘মিনেরা পুলসিরাত অতিক্রম করে কানত্বারাতে অবস্থান করবে বা দাঁড়াবে। আর তা (কানত্বারাহ্) হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান, এখানে ঐ সকল

মুমিনদেরকে দাঁড় করানো হবে, যারা পুলসিরাত অতিক্রম করে এসেছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে (এখানে দাঁড় করানো হবে)। অতঃপর তাদের পরিশুদ্ধির পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا».

“মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তারপর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী কানত্বারাহ্ নামক স্থানে আটকানো হবে। তারপর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যে যুলুম নির্যাতন ঘটেছিল একে অপরের পক্ষ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। যখন তারা

এসব থেকে মুক্ত হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর শপথ সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকের দুনিয়ার বাসস্থান থেকে জান্নাতের বাসস্থান অধিক উত্তমভাবে চিনে নিতে সমর্থ হবে।” (সহীহ বুখারী)

একাদশতম: জান্নাত ও জাহান্নাম

আমরা ঈমান আনবো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এ দু’টি (জান্নাত ও জাহান্নাম) বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে, আর তা কখনো ধ্বংস হবে না, নিঃশেষও হবে না, বরং সর্বদা থাকবে। আর জান্নাতবাসীদের নি‘আমত শেষ ও ঘাটতি হবে না, অনুরূপ জাহান্নামীদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ চিরস্থায়ী শাস্তির ফায়সালা করেছেন তার শাস্তি কখনও বিরত ও শেষ হবে না।

তবে তাওহীদপন্থীরা, আল্লাহর রহমতে ও শাফা‘আতকারীদের শাফা‘আতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন।

আর জান্নাত হলো, অতিথিশালা, যা আল্লাহ কিয়ামতে মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে রয়েছে প্রবাহিত নদী উন্নত ও সুউচ্চ কক্ষ, মনোলোভা রমণীগণ। **তথায় আরো রয়েছে মনঃপূত**-মনোহর সামগ্রী যা কোনো দিন কোনো চক্ষু দেখে নি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করে নি, আর কোনো মানুষের অন্তরেও কোনো দিন কল্পনায় আসে নি।

জান্নাতের নি'আমত চিরস্থায়ী, কোনো দিন শেষ হবে না। জান্নাতে চাবুক সমতুল্য জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

আর জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বৎসর দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে। জান্নাতে মুমিনদের জন্য সব চাইতে বড় নি'আমত হলো আল্লাহকে সরাসরি স্বচক্ষে দর্শন লাভ করা।

কিন্তু কাফিররা আল্লাহর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত হবে: আর যারা মুমিনদের জন্য তাদের রবের দর্শনকে অস্বীকার করলো সে বস্তুতঃ এ বঞ্চিত হওয়াতে

মুমিনদেরকে কাফিরদের ন্যায় মনে করলো। আর জান্নাতে একশতটি ধাপ রয়েছে, এক ধাপ থেকে অপর ধাপের দূরত্ব আসমান থেকে জমিনের দূরত্ব অনুরূপ। আর সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম জান্নাত হল, জান্নাতুল ফিরদাউস আল-আ'লা। এর ছাদ হলো আল্লাহর 'আরশ। আর জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, প্রত্যেক দরজার পার্শ্বের দৈর্ঘ্য 'মক্কা' থেকে 'হাজর' এর দূরত্বের সমান। আর এমন দিন আসবে যে দিনে তা ভীড়ে পরিপূর্ণ হবে, আর জান্নাতে নূন্যতম মর্যাদার অধিকারী যে হবে তার জন্য দুনিয়া ও আরো দশ দুনিয়ার পরিমাণ জায়গা হবে।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন,

﴿أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ [ال عمران: ١٣٣]

"মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩]

জান্নাতবাসীরা চিরস্থায়ী, আর জান্নাতও ধ্বংস হবে না: এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨﴾ [البينة: ٨]

“তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে যে তার রবকে ভয় করে।” [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত: ৮]

আর জাহান্নাম: তা তো শাস্তির ঘর যা আল্লাহ কাফির ও অবাধ্যদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি রয়েছে। তার পাহারাদার হবে নিষ্ঠুর ও নির্দয় ফিরিশতারা। আর কাফিররা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম

(কাঁটাযুক্ত) আর পানীয় হবে পুঁজ, দুনিয়ার আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাহান্নামের আগুণ দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ (ঊনসত্তর) গুণ বেশি, এর প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় বা তার চাইতে আরো উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম তার অধিবাসী নিয়ে পরিতুষ্ট হবে না বরং বলবে যে, আরো আছে কি? তার সাতটি দরজা হবে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামীদের অংশ থাকবে।

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন,

﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ١٣١﴾ [ال عمران: ١٣١]

“কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩১]

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী এবং তা ধ্বংস হবে না: এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٦٥﴾ [الاحزاب: ٦٤، ٦٥]

“নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৫]

(৩) শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনার ফলাফল:

শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনার অনেক সুফল রয়েছে:

(১) সাওয়াবের আশায় আনুগত্য ও কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া।

(২) এ দিবসের শাস্তির ভয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত ও সেটার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা থেকে বেঁচে থাকা।

(৩) আখিরাতে মুমিনরা যে নি‘আমত ও ছাওয়াব পাবে এ আশা- আকাঙ্খায় দুনিয়ার ছুটে যাওয়া জিনিস থেকে নিজের শান্তনা লাভ করা।

(৪) ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে সৌভাগ্যের মূল উৎস হল শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনা। কারণ মানুষ যখন এ কথার ওপর ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টজীবকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন ও তাদের হিসাব-নিকাশ নিবেন এবং তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। মাযলুমের (অত্যাচারিত) পক্ষে যালিম (অত্যাচারকারী) ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তখন সে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সকল অকল্যাণের উৎস নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজে কল্যাণ বিস্তার লাভ করবে এবং সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়বে। প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বেড়ে যাবে।

ষষ্ঠ রুকন: তাকদীরের ওপর ঈমান

(১) কদরের (তাকদীরের) সংজ্ঞা ও তার ওপর ঈমান আনার গুরুত্ব:

কদর বা (ভাগ্য) হলো, আল্লাহর অনন্ত জ্ঞান ও হিকমাত অনুযায়ী সৃষ্টিকুলের সকল কিছু নির্ধারণ। আর তা আল্লাহর কুদরতের ওপর নির্ভরশীল, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

আর তাকদীরের ওপর ঈমান আনা আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়াত বা প্রভুত্বের ওপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম একটি রুকন। এর ওপর ঈমান আনা ছাড়া এই ছয়টি রুকনের ওপর ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ۝٤٩﴾ [القمر: ٤٩]

"নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আল-ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أوالكيس والعجز».

“প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত, এমনকি অপারগতা ও অলসতা অথবা অলসতা ও অপারগতাও।” (সহীহ মুসলিম)

(২) তাকদীরের স্তর:

চারটি স্তর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাকদীরের ওপর ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে:

প্রথমতঃ আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানের ওপর ঈমান আনা, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧﴾ [الحج: ٧٠]

“তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয় আল্লাহ অবগত যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, নিশ্চয় তা কিতাবে লিখিত

আছে আর নিশ্চয় তা আল্লাহর নিকট সহজ।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭০]

দ্বিতীয়তঃ লাওহে মাহফুযে আল্লাহর জানা মোতাবেক ভাগ্যসমূহ লিখে রাখার ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ﴾ [الانعام: ٣٨]

“আমরা কিতাবে কোনো কিছু লিখতে ছাড়ি নি।” [সূরা আন‘আম আয়াত: ৩৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

“আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি জীবের তাকদীরসমূহ লিখে রেখেছেন।” (সহীহ মুসলিম)

তৃতীয়ত: আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছা ও তাঁর ব্যাপক শক্তির ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾ [التكوير: ٢٩]

“সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই তোমরা ইচ্ছা করতে পার না।” [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলেন, যে ব্যক্তি তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

«ما شاء الله وشئت»

আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন (‘এবং’ সংযুক্ত করে)।

«أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده».

“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং তিনি একাই চেয়েছেন।” (আহমদ)

চতুর্থত: নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা; এর ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ۝٦٢﴾ [الزمر: ٦٢]

“আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর অভিভাবক।” [সূরা-আয-যুমার, আয়াত: ৬২]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ۝٩٦﴾ [الصافات: ٩٦]

“আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আস-সাফফাত আয়াত: ৯৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله يصنع كل صانع وصنعته».

“নিশ্চয় আল্লাহ সকল আবিস্কারক ও তার আবিস্কারকে সৃষ্টি করেন।” (সহীহ বুখারী)

(৩) তাকদীরের প্রকার:

(ক) সকল সৃষ্টজীবের সাধারণ তাকদীর লিপিবদ্ধকরণ। আর সেটাই আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(খ) সারা জীবনের তাকদীর লিপিবদ্ধকরণ। আর তা হলো বান্দার মাঝে রুহ্ বা আত্মা ফুঁকে দেওয়ার সময় থেকে তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারণ করা।

(গ) বাৎসরিক তাকদীর নির্ধারণ। আর তা হলো, প্রত্যেক বৎসর যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারণ করা। সেটা প্রত্যেক বৎসরের লাইলাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রজনীতে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ٤﴾ [الدخان: ٤]

“এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।” [সূরা-আদ-দুখান আয়াত: ৪]

(ঘ) দৈনন্দিন তাকদীর নির্ধারণ, আর তা হলো সম্মান, অপমান, (কিছু) দেওয়া না দেওয়া জীবিত করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি যা দৈনন্দিন সংঘটিত হবে, তা নির্ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسۡـَٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ ۝٢٩﴾ [الرحمن: ٢٩]

"আসমান ও জমিনে বিচরণশীল সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী, প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো মহৎকর্মে রত রয়েছেন।" [সূরা আর-রহমান আয়াত: ২৯]

(৪) তাকদীরের ব্যাপারে সালাফদের আকীদা বা বিশ্বাস হলো:

নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, তার মালিক বা অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টির পূর্বে সেগুলোর তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাদের বয়স, রুযী, কর্মসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আরো লিখে রেখেছেন যে সৌভাগ্যশালী অথবা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার দিকে তারা ধাবিত হবে।

প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে হিসাব করে রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর যা হয়েছে ও হবে তা সবই জানেন। আর যা হয় নি যদি তা হতো কীভাবে হতো তাও জানেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাশীল। যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন।

আর নিশ্চয় বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে, যা দ্বারা তাদেরকে যে সকল কাজের সমর্থ্যবান করেছেন তা সম্পাদন করে এই বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ যা চান শুধুমাত্র তাই হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“আর যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথসমূহে পরিচালিত করি।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯]

আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার ও তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা, আর তারাই এই কর্মগুলো প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনকারী। ওয়াজেব ছেড়ে দেওয়া কিংবা হারাম কাজ করাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো কোনো হুজ্জাত বা দলীল দাঁড় করানোর সুযোগ নেই, বরং বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পূর্ণ দলীল রয়েছে। বিপদ-আপদে তাকদীরকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হলেও নিন্দনীয় ও পাপের কাজে তাকদীরের অযুহাত দেওয়া বৈধ নয়। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম ও মূসা আলাইহিমাস সালামের পরস্পর বিতর্কের ব্যাপারে বলেন,

«تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصتفاك الله

برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدّر عليّ قبل أن أخلق فحج آدم موسى».

“আদম ও মূসা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, অতঃপর মূসা বললেন, হে আদম তোমাকেই তো তোমার পাপ জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিল। তারপর আদম তাঁকে বললেন, হে মূসা! তোমাকেই তো আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও কথাপকোথনের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন? তারপরও তুমি আমাকে এমন বিষয়ের ওপর দোষারোপ করছ যা আল্লাহ আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার ওপর নির্ধারণ করে রেখেছেন। এভাবে আদম মূসার ওপর জয়ী হলেন[1]। (সহীহ মুসলিম)

[1] এখানে অবশ্যই এটা বুঝা উচিৎ যে, আদম আলাইহিস সালাম এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া বিপদ ও মুসীবত। যা আমার ওপর পূর্ব নির্ধারিত। জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া পাপ ও অপরাধ নয়, যদি তা হতো তবে আদম আলাইহিস সালাম পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর দিয়ে দলীল পেশ করতেন না। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে বিপদাপদে পূর্ব নির্ধারিত তাকদীরের দোহাই দেওয়া যাবে, কিন্তু পাপ ও অপরাধমূলক কাজে তাকদীরের দোহাই দেওয়া যাবে না।

(৫) বান্দাদের কর্মসমূহ

যে সকল কাজ আল্লাহ তা‘আলা এই নিখিল বিশ্বে পরিচালনা করেন তা দু’ভাগে বিভক্ত:

এক: আল্লাহ তা‘আলার কর্মসমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে পরিচালনা করেন, তাতে কারো কোনো প্রকার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার নেই। বস্তুর সকল ইচ্ছা আল্লাহর জন্য। যেমন জীবিত করা মৃত্যু দান করা সুস্থ ও অসুস্থ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات: ٩٦]

“আর আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ﴾ [الملك: ٢]

[সম্পাদক]

“যিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ২]

দুই: আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর তা সম্পাদনকারীর ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, কারণ আল্লাহ তাদের ওপর সেটা করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨﴾ [التكوير: ٢٨]

“যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়।” [সূরা আল-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ﴾ [الكهف: ٢٩]

“অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক।” [সূরা আল-ক্বাহাফ, আয়াত: ২৯]

ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হক্বদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য তারা অপমানের হক্বদার। আল্লাহ শুধুমাত্র ঐ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ٢٩﴾ [ق: ٢٩]

"আর না আমি বান্দাদের ওপর যুলুমকারী।" [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ২৯]

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেউ ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেউ তাকে ছাদ থেকে ফেলে দিতে পারে। প্রথম উদাহরণ হলো ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হলো নিরুপায়ের।

(৬) আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমন্বয়:

আল্লাহ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন ও তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃতপক্ষে তার কর্মের

সম্পাদনকারী, সারাসরি তা আদায়কারী। কারণ, তার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে।

অতঃপর সে যদি ঈমান আনে, তবে সে তার ইচ্ছায় ও ইরাদায় ঈমান আনলো। আর সে যদি কুফ্‌ুরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ ইরাদায় কাফির হলো। যেমন, আমরা বলে থাকি যে, এই ফল এই গাছের আর এই ফসল এই ক্ষেতের। অর্থ হলো, নিশ্চয় তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর আল্লাহর দিক থেকে এর অর্থ হবে, নিশ্চয় আল্লাহ এটাকে তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এই দুইয়ের মাঝে কোনো প্রকারের বিরোধ নেই।

আর এর দ্বারা (শার'উল্লাহ) আল্লাহর প্রণয়ন ও তাঁর নির্ধারণ এক বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات: ٩٦]

“অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠﴾ [الليل: ٥، ١٠]

“অতএব, যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমরা তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব, আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমরা তাকে কষ্টের জন্যে সহজ পথ দান করব।” [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০]

(৭) তাকদীরের ব্যাপারে বান্দার করণীয়:

তাকদীরের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কাজ হলো দু’টি:

প্রথম: সম্ভাব্য কাজ সম্পাদন ও সতর্ককৃত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। আল্লাহর কাছে আরো চাইতে হবে যেন তিনি তার জন্য সহজ কাজকে করার তাওফীক দেন, আর কঠিন সাধ্য কাজ থেকে তাকে বিরত রাখেন। আর তাঁর ওপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। অতঃপর কল্যাণ অর্জনের জন্য ও অকল্যাণ বর্জনের জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

“তোমার জন্য কল্যাণকর কাজের প্রতি যত্নবান হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অপারগতা প্রকাশ করিও না। আর তুমি যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হও তবে এইরূপ বলিও না যে আমি যদি এ কাজ করতাম তাহলে এই হত; বরং বল যে, ‘এটা

আল্লাহর নির্ধারণ, আর তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন’। কারণ, ‘যদি’ কথাটি শয়তানের কর্ম খুলে দেয়।

দ্বিতীয়: বান্দা তার ওপর নির্ধারিত বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করবে, ঘাবড়াবে না। অতঃপর জানবে যে, নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিবে। আরো জ্ঞাত হবে- যে বিপদ তাকে আক্রমন করেছে তা তাকে ভুল করে অতিক্রম করে চলে যাবার নয়। আর যে বিপদ তাকে আক্রমণ করে নি তা তাকে কোনো ভাবেই স্পর্শ করার ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك».

“আরো জ্ঞাত হবে- যে বিপদ তোমাকে আক্রমণ করেছে তা তোমাকে ভুল করে অতিক্রম করে চলে যাবার নয়। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমণ করেনি তা তোমাকে স্পর্শ করার ছিল না”।

(৮) তাকদীর ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা:

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য; কেননা তা আল্লাহর রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল মুমিনের পক্ষে আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য।

কারণ, আল্লাহর সকল কর্ম ও ফায়সালাই ভালো (ন্যায়পূর্ণ) ইনসাফভিত্তিক, হিকমাতপূর্ণ। সুতরাং যার আস্থা থাকবে যে, নিশ্চয় যে সুখ বা দুঃখ তাকে স্পর্শ করেছে তা তাকে ভুল করে অতিক্রম করে চলে যাবার ছিল না আর যা তাকে ছেড়ে গেছে বা স্পর্শ করে নি তা তার নিকট পৌঁছার ছিল না, সে ব্যক্তি পেরেশানী ও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে। আর তার জীবন হতে ব্যাকুলতা ও দোদুল্যমানতা দূর হবে। চলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বস্তুর ওপর চিন্তিত হবে না। আর তার ভবিষ্যৎকে ভয় পাবে না। আর এর মাধ্যমে সে সব চাইতে সৌভাগ্যপূর্ণ হবে, আত্মার দিক দিয়ে

সব চেয়ে পবিত্র হবে, আর সব চেয়ে প্রশান্ত হৃদয় হবে।

আর যে জানতে পারবে যে, তার বয়স সীমিত, রুযী পরিমিত, সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে, কাপুরুষতা বয়স বাড়াতে পারে না, কার্পণ্যতা রুযী বাড়াতে পারে না, সবই লিখিত রয়েছে, তখন সে বিপদের ওপর ধৈর্য ধারণ করবে, পাপ ও ত্রুটিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করার কারণে ক্ষমা চাইবে। আর আল্লাহ যা (তার জন্য) নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তবেই আদেশের আনুগত্য আর বিপদের ওপর ধৈর্য ধারণের মাঝে সমন্বয় গড়তে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: ١١]

“আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রকার বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, আল্লাহ তার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করাবেন। আল্লাহ

সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১১]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ﴾ [غافر: ٥٥]

“অতএব, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” [সূরা গাফ‍ির, আয়াত: ৫৫]

(৯) হিদায়াত দু’ প্রকার: (হিদায়াতের দু’টি অর্থ)

প্রথম: হিদায়াত অর্থ, সত্যের সন্ধান দেওয়া, সৎপথ প্রদর্শন করা। আর সকল সৃষ্টজীবই এর মালিক। আর সকল রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ এরই মালিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ۝٥٢﴾ [الشورى: ٥٢]

“নিশ্চয় আপনি সরলপথ প্রদর্শন করেন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫২]

দ্বিতীয়: হিদায়াত এর অর্থ, আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদেরকে (ভালো কাজের) তাওফীক প্রদান করা ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা বা অটল রাখা, (আর তা) তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ। আর এ হিদায়াতের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ﴾

[القصص: ٥٦]

"আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।" [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৫৬]

(১০) (আল্লাহর) কুরআনে বর্ণিত ইরাদা দু' প্রকার:

প্রথম: ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া বা সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক ইচ্ছা, আর তা হচ্ছে, সকল সৃষ্টিকূলের জন্য নির্ধারিত ইচ্ছা। সুতরাং আল্লাহ যা চান তা হয়, আর যা

চান না তা হয় না। এ সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক ইচ্ছা বা ইরাদা (কাউনিয়া ও ক্বাদারিয়া) অবশ্যই সংঘটিত হবে; কিন্তু শরী‘আতগত ইচ্ছা বা ইরাদা শর‘ঈয়াহ’র সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেটাকে তার পক্ষ থেকে ভালোবাসা কিংবা সেটার প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া জরুরি নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ﴾ [الانعام: ١٢٥]

“আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৫]

দ্বিতীয়: ইরাদা দীনিয়া শর‘ঈয়াহ, (দীন হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছা) তা হল, দীনী নির্দেশ বা উদ্দেশ্য, আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেটার অনুসারীকে ভালোবাসা ও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তবে ইরাদা দীনিয়া শর‘ঈয়াহ ততক্ষণ বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে

ইরাদা কাউনিয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা) সংযুক্ত না হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

আর 'ইরাদা কাউনিয়া' অধিক ব্যাপক, কারণ সকল 'শারয়ী ইরাদা' যা বাস্তবায়িত হয় তা সৃষ্টিগত দিক হতেও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে ঘটে যাওয়া সকল 'ইরাদা কাওনীয়া' (সৃষ্টিগত ইচ্ছা) তা শরী'আতে উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং কখনও আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও শর'ঈ উভয়টিই বাস্তবায়িত হয়। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের মাঝে উভয় প্রকার ইরাদা বা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

আবার কখনও কখনও কেবল আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়, সেখানে শরী'আতগত ইচ্ছা থাকে না।

যেমন, আবু জাহল এর কুফুরী। তাতে শুধুমাত্র আল্লাহর ইরাদা কাওনিয়া বা সৃষ্টিগত ইচ্ছা ছিল।

আবার কখনও কখনও কোনো কিছুতে আল্লাহর ইরাদা কাউনিয়া বা সৃষ্টিগত ইচ্ছা থাকে না, যদিও তা ইরাদা শর‘ইয়াহ বা শারী‘আতের দিক থেকে প্রত্যাশিত ছিল। যেমন, আবু জাহেলের ঈমান।

সুতরাং যদিও আল্লাহ নাফরমানী সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন ঘটে যাওয়ার দিক থেকে এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে তা চান কিন্তু তিনি তা দীন হিসাবে পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না ও তার প্রতি নির্দেশও দেন না। বরং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অপছন্দ করেন, তা থেকে বান্দাদেরকে নিষেধ করেন ও তা সম্পাদনকারীকে সাবধান করেন। যদিও আর এসব কিছু তাঁরই নির্ধারণ। পক্ষান্তরে আনুগত্যপূর্ণ কর্ম ও ঈমান আনয়ন করাকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন, সেটার নির্দেশ দিয়েছেন, তার সম্পাদনকারীকে নেকী ও সুন্দর প্রতিদানের ওয়াদা দিয়েছেন। যদিও তাঁর ইরাদা

ছাড়া তাঁর নাফরমানী করা যায় না। আর আল্লাহ তা‘আলা যা চান শুধু তাই সংঘটিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ﴾ [الزمر: ٧]

“আর (আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের কুফুরী পছন্দ করেন না।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ ٢٠٥﴾ [البقرة: ٢٠٥]

“আল্লাহ ফাসাদ (অশান্তি) পছন্দ করেন না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০৫]

(১১) ঐ সকল আসবাব বা কারণসমূহ যা তাকদীর পরিবর্তন করে[2]:

[2] এ পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে এটা আল্লাহর পূর্বজ্ঞান বা পূর্বলিখনকে পরিবর্তন করে। বরং এর দু’টি অর্থ হতে পারে। **এক.** এ কারণগুলো তাকদীরেই উল্লেখ করা আছে, সেখানে আছে যে, সে অমুক কাজটি করবে, সে কারণে তাকে এ

আল্লাহ কিছু কারণ তৈরি করে রেখেছেন যা তকদীরকে পরিবর্তন ও প্রতিরোধ করে। যেমন, দো‘আ, সাদাকাহ্, ঔষধ, সতর্কতা অবলম্বন, (নিজের) কর্মদক্ষতা ব্যবহার করা; কেননা, বিষয় ও কারণ সবই আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁরই নির্ধারণ, এমনকি অপারগতা- অক্ষমতা ও বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা।

(১২) তাকদীরের মাসআলা বা বিষয়টি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মাঝে তাঁর একটি রহস্যময় বিষয়:

তাকদীর নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তাঁর সৃষ্টজীবের মাঝে এ কথাটি শুধুমাত্র তাকদীরের গোপন

জিনিসটি দেওয়া হলো।

দুই. ফিরেশতাদের কাগজে যা লিখা হয় তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়, সেটাতেই পরিবর্তন করা হয়। এর সমর্থনে সূরা আর-রা‘দ এর নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়,

﴿يَمۡحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ٣٩﴾ [الرعد: ٣٩]

“আল্লাহ যা ইচ্ছে তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে তা ঠিক রাখেন, আর তার কাছেই রয়েছে মূল কিতাব (লাওহে মাহফুয) (অর্থাৎ সেখানে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না)। [সম্পাদক]

দিকের জন্য প্রযোজ্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকত শুধুমাত্র আল্লাহ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন, আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, হিদায়াত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন ও কিছু প্রদান করেন। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا ذكر القدر فأمسكوا».

“যখন তাকদীরের কথা স্মরণ হবে তখন তোমরা তা নিয়ে তর্ক বির্তকে লিপ্ত না হয়ে চুপ থাকবে।” (সহীহ মুসলিম)

তবে তাকদীরের অন্যান্য দিক ও তাঁর মহা হিকমাত স্তর, মর্যাদা ও তাঁর প্রভাব মানুষের নিকট বর্ণনা করা ও তা মানুষদেরকে জানানো বৈধ রয়েছে। কারণ তাকদীরের ওপর ঈমান আনা ঈমানের রুকনসমূহের একটি অন্যতম রুকন, যা শিক্ষা করাও জানা একান্ত কর্তব্য। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যখন জিবরীল আলাইহিস সালামের নিকট ঈমানের রুকনসমূহ উল্লেখ করেন, তখন বলেন,

«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم».

“উনি হলেন জিবরীল, তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন”।

(১৩) তাকদীরের দ্বারা দলীল দেওয়া:

ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে এই সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান, যা গায়েবী বিষয় তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। যা মানুষ ও জিন্নদের অজানা। এতে কোনো ব্যক্তিরই স্বীয় পক্ষ গ্রহণের দলীল নেই। আর যে বিষয় ফায়সালা হয়ে গেছে তার ওপর ভরসা করে কর্ম ত্যাগ করা ঠিক নয়। সুতরাং তাকদীরকে আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর সৃষ্টির কারো জন্য দলীল বা হুজ্জাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

যদি খারাপ কাজ করার ওপর তাকদীরের দ্বারা দলীল দেওয়া বৈধ হতো তাহলে অত্যাচারী শাস্তিপ্রাপ্ত হতো না,

মুশরিক ব্যক্তির হত্যা হতো না, হদ বা বিধান প্রতিষ্ঠিত হতো না, আর কেউ অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকতো না। আর তা দীন ও দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম হত, যার ভয়াবহতা সকলের জানা।

আর যারা ভাগ্য দ্বারা দলীল দেয়, তাদেরকে আমরা বলবো তুমি জান্নাতী না জাহান্নামী এ ব্যাপারে তোমার নিকট তো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর যদি তোমার নিকট এ ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান থাকত অবশ্যই আমরা তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিতাম না ও অন্যায় থেকে নিষেধও করতাম না; বরং তুমি কর্ম সম্পাদন কর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাওফীক প্রদান করবেন, আর তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিছু কিছু সাহাবী যখন তাকদীরের হাদীসসমূহ শুনতেন তখন বলতেন, এখন তুমি আমার চাইতে বেশি প্রচেষ্টাকারী নও। (অর্থাৎ আমি বেশি প্রচেষ্টাকারী, আমি তাকদীরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকার মত লোক নই, তাকদীরকে বাহানা করে আমল ছেড়ে দেওয়ার

লোক আমি নই)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাকদীরের দ্বারা দলীল দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

«اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»

“তোমরা কর্ম সম্পাদন করতে থাকো, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজসাধ্য হবে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তার জন্য সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেটা করা সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে দূর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সে কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করলেন,

﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠﴾ [الليل: ٥، ١٠]

“অতএব, যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমরা তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমরা তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।” [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০]

(১৪) আসবাব বা (মাধ্যমসমূহ) গ্রহণ করা

বান্দার নিকট দু’ প্রকার কাজ উপস্থিত হয়:

(১) এমন কর্ম যাতে বাহানা বা অজুহাত রয়েছে, তবে তা সম্পাদনে সে অপারগ নয়।

(২) এমন কর্ম যাতে বাহানা ও অজুহাতের অবকাশ নেই, আর তা পালনে সে ধৈর্য ধারণ করে না।

বান্দা কোনো বিপদ পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা সে বিপদ সম্পর্কে জানেন। ‘আল্লাহর বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে’ এর অর্থ এই নয় যে, তিনিই বিপদগ্রস্ত

ব্যক্তিকে বিপদে পতিত করেছেন, বরং এ বিপদ পতিত হয়েছে এর নির্ধারিত কারণসমূহের দ্বারাই।

যদি বিপদ থেকে রক্ষাকারী মাধ্যম যা ব্যবহার ও গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শরী'আত অনুমতি দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করার কারণে সে বিপদে পতিত হয়, তবে সে নিজেকে হিফাযত না করার কারণে ও তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষাকারী মাধ্যম গ্রহণ না করার কারণে দোষী হবে।

আর যদি এই বিপদ প্রতিরোধ করার তার ক্ষমতা না থাকে তবে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

সুতরাং মাধ্যম গ্রহণ করা তাকদীর ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং তা (মাধ্যম) গ্রহণ করা এরই (তাকদীর ও তাওয়াক্কুলেরই) অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন তাকদীর অনুযায়ী কর্ম শুরু হয়ে যায়, তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে নেওয়া কর্তব্য হয়ে যায় ও নিম্নের কথার দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করবে। (قدّر الله

(وما شاء فعل) “আল্লাহ তা নির্ধারণ করেছেন আর তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। তবে ভাগ্য পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের দায়িত্ব হলো বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করা ও তাকদীরের দ্বারা তাকদীরকে প্রতিরোধ করা। নবীগণ নিজেদেরকে নিজেদের শত্রু থেকে হিফাযত করার জন্য বিবিধ পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তারা আল্লাহর অহী ও নিরাপত্তা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ভরসাকারীদের নেতা ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি মাধ্যম গ্রহণ করতেন, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকার পরও। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الانفال: ٦٠]

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য, যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর

শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥﴾ [الملك: ١٥]

“তিনি তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।” [সূরা-আল-মূলক, আয়াত: ১৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان».

“দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়, তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা তোমাকে উপকার করবে তা আদায়ে তুমি যত্নবান হও। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর অপারগতা প্রকাশ করিও না। তোমাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করলে তুমি বলিও না যে নিশ্চয় যদি আমি এই কাজ করতাম তবে এই এই হতো বরং তুমি বল, আল্লাহ তা নির্ধারণ করেছেন আর তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ ‘যদি’ (لو) বর্ণটি শায়তানের কর্মকে খুলে দেয়।” (সহীহ মুসলিম)

(১৫) তাকদীরকে অস্বীকারকারীর বিধান:

যে ব্যক্তি তাকদীরকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরী‘আতের মূলনীতিসমূহের একটি অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। আর এর মাধ্যমে সে কুফুরী করলো। কিছু কিছু উত্তম পূর্বসূরী (সালাফে সালেহ্) বলেন,

«ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا».

“তোমরা কাদরীয়াহ সম্প্রদায়ের সাথে (আল্লাহর) সর্বব্যাপী জ্ঞান (সাব্যস্ত করা) দ্বারা বিতর্ক কর, তারা যদি তা (আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান) অস্বীকার করে তাহলে তারা কাফির হয়ে গেলো, আর যদি তারা (সর্বব্যাপী জ্ঞান) স্বীকার করে, তাহলে তারা (তোমাদের সাথে) ঝগড়ায় হেরে গেলো।[3]

(১৬) তাকদীরের ওপর ঈমান আনার ফলাফল:

ফায়সালা ও তাকদীরের ওপর ঈমান আনার অনেক শুভ-পরিণাম, সুন্দর প্রভাব রয়েছে যা জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে:

---

[3] কারণ, আল্লাহ যদি আগে থেকেই সবকিছু জানেন তবে সে জ্ঞান অনুসারে তিনি তা তাকদীর বা নির্ধারণ করতে বাধা কোথায়? সে হিসেবে তাকদীর অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এভাবেই তাকদীর অস্বীকারকারী কাদারীয়া ফেরকার লোকেরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকদের সাথে তর্কে হেরে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। [সম্পাদক]

(ক) তাকদীরের ওপর ঈমান বিভিন্ন প্রকার নেক আমল ও ভাল গুণ অর্জন করার সুযোগ তৈরি করে। যেমন, আল্লাহর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা, তাঁর প্রতি ভালো ধারণা রাখা, ধৈর্য ধারণ করা, প্রখর সহনশীলতা, নৈরাশ্য দূর করা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া পেয়ে খুশী হওয়া। একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনয়, নম্রতা প্রকাশ করা, উদাসীনতা ও অহংকার ত্যাগ করা। আল্লাহর প্রতি ভরসা করে ভালো পথে ব্যয় করার মন মানষিকতাও সৃষ্টি করে। বীরত্ব সৃষ্টি করে, ভালো কাজ করার দিকে অগ্রসর করে, অল্পে তুষ্ট থাকার গুণ তৈরী করে, আত্মসম্মানী করে, উচ্চাভিলাষী করে, কর্ম দক্ষতা সৃষ্টি করে, কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা তৈরী করে সুখে-দুখে মধ্য পথ অবলম্বনকারী তৈরি করে, হিংসা ও প্রতিবাদ করা থেকে নিরাপদে রাখে। বাজে গাল-গল্প, বাতিল কাজ থেকে বিবেককে মুক্ত রাখে। আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা করে।

(খ) তাকদীরের ওপর ঈমান ওয়ালা ব্যক্তি তার জীবনে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হয়।
অধিক নি'আমত তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর বিপদে নিরাশ হয় না। আর সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তাকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে তা (তার জন্য) আল্লাহর নির্ধারণ মাত্র, তার পরীক্ষাস্বরূপ। ঘাবড়ায় না, বিচলিত হয় না; বরং ধৈর্য ধারণ করে ও সওয়াবের আশা রাখে।

(গ) তাকদীরের ওপর ঈমান তার লোককে পথভ্রষ্টতার কারণসমূহ ও জীবনের অশুভ সমাপনী থেকে হিফাযত করে। এটি মুমিনের জন্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা থাকার স্থায়ী প্রচেষ্টা, নেক কাজ বেশি বেশি করার সুযোগ, নাফরমানীপূর্ণ ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ করে দেয়।
(ঘ) তাকদীরের ওপর ঈমান মুমিনদের জন্য সুদৃঢ় অন্তর ও পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা ভয়ানক ও কঠিন কর্মকে প্রতিহত করার মনোভাব তৈরি করে দেয়, মাধ্যম বা

উপকরণ গ্রহণ করার দ্বারা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمــؤمن، إن أصابته سراء شــكر فكان خــيرا له، وإن أصــابته ضراء صــبر فكان خيرا له».

“কি আর্শ্চয্য! নিশ্চয় মুমিনের সকল কর্মই ভালো, আর তা শুধু মুমিনের জন্য খাস, যদি তাকে কোনো আনন্দ স্পর্শ করে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তাঁর জন্য কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ হয়।” (সহীহ মুসলিম)

সমাপ্ত

মুসলিম হিসেবে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়, সে মুমিন বান্দা। আত্মায়-ক্বলবে, মানবীয় আচরণের যাবতীয় অনুষঙ্গে যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন ও রূপায়নে অভিলাষী, তার প্রথমে ঈমানের যাবতীয় দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি প্রয়োজন। বইটি এমন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য।